# কংগ্রেস সংগঠনে বাঙ্গলা

শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য্য

এম. এ., বি. এল্.

বেঙ্গল পাবলিশার্স

১৪, বঙ্কিম চাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা

যাঁহার সহিত একত্রে রাজনীতিতে নামিয়াছিলাম
তাঁহারই স্মৃতির উদ্দেশে
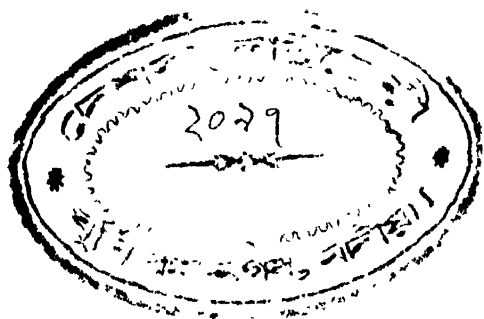
# প্রারম্ভ

প্রায় দশবৎসর পূর্ব্বে কংগ্রেসের পঞ্চাশত্তম বর্ষপূর্ত্তির জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষ্যে "আনন্দবাজার পত্রিকায়" প্রকাশিত[১] লেখকের প্রবন্ধ "বাঙ্গলার নিকট কংগ্রেসের ঋণ—অর্দ্ধশতাব্দীর সাধনা"—এই পুস্তকের প্রধান অবলম্বন। প্রবন্ধ প্রকাশের পর যথেষ্ট সময় অতিবাহিত হইয়াছে বটে কিন্তু যে কারণে এবং যে অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া প্রবন্ধ প্রকাশের প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছিল তাহার বিশেষ পরিবর্ত্তন হইয়াছে কিনা নিশ্চিত নহে। ঘটনাচক্রের বিবর্ত্তনে তাহা সাময়িকভাবে চাপা পড়িয়াছে সত্য। তবে কংগ্রেস সংগঠন পুনরায় সজীব ও সক্রিয় না হইয়া উঠিলে প্রকৃত অবস্থা বোঝা যাইবে না। বাঙ্গলা কংগ্রেসের নেতা নাই এবং কংগ্রেসের নেতৃস্থানীয় বলিয়া স্বীকৃত ব্যক্তিদের মধ্যে বাঙ্গালী কেহ নাই। বাঙ্গলায় বর্ত্তমানে যাহারা নায়ক বলিয়া গৃহীত নিখিল ভারতীয় কংগ্রেসী রাজনীতিতে তাঁহারা লব্ধপ্রতিষ্ঠ নহেন। কংগ্রেসের নেতারূপে বাঙ্গলা হইতে যিনি দাঁড়াইতে পারিতেন তাঁহার জীবনের বিচিত্র বিপর্য্যয়ের ফলে পূর্ব্বোক্ত অবস্থা হয়তো আরও কঠোরতর হইয়া উঠিবে।

জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষ্যে কংগ্রেসের তরফ হইতে যে ইতিহাস[২] প্রকাশিত হইয়াছে বাঙ্গলার নিকট কংগ্রেসের ঋণ তাহাতে স্বীকৃত নহে বরং স্বীকার না করিবার মনোবৃত্তিই ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহাতে বিক্ষুব্ধ হইয়া প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিতে বাধ্য হন এবং

১ ২৭শে ডিসেম্বর, ১৯৩৫

২ History of Congress—Pattavi Sitaramayya

উক্ত ইতিহাসের সবিশেষ আলোচনা করিয়া উহার সংশোধন দাবী করেন। প্রতিবাদের ফলে ডাঃ পট্টভী এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়া পরবর্ত্তী সংস্করণে ইহা সংশোধন করিবার আশ্বাস দেন। একটী স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদে ইহা আলোচিত হইয়াছে।

জয়ন্তী উৎসবের সমসাময়িক একটী অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ব্যাপারের ইতিহাস উক্ত মনোভাবের নিদর্শন হিসাবে উল্লেখ করিবার যোগ্য। কিন্তু বর্ত্তমান পুস্তকের স্বল্প পরিসরের মধ্যে সে ইতিহাস বিবৃত কবিবার স্থান নাই, মাত্র উল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত হইব। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের অঙ্গীভূত বৃটিশ গবর্ণমেন্টের সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত, তৎসম্বন্ধে কংগ্রেসের অযৌক্তিক মনোভাব এবং এই উভয়ের বিরুদ্ধে বাঙ্গলাদেশের আন্দোলনের কথা বলিতেছি। সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত সমগ্র ভারতবর্ষের জন্য রচিত হইলেও উহার আঘাত যে প্রকৃতপক্ষে জাতীয়তার পীঠভূমি বাঙ্গলাদেশকে লক্ষ্য করিয়াই উদ্যত হইয়াছে তাহা বুঝিতে কাহারও বাকী ছিল না, বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষ ইহা স্বীকারও করিয়াছেন। ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইন যখন পার্লামেন্টের কমন্সসভায় আলোচিত হইতেছিল তৎকালে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে তদানীন্তন ভারতসচিব স্যার সামুয়েল হোর বলিয়াছিলেন—

> "I do not wish to make prophecies about the future, least of all the Indian future. But I would ask Hon. Members to look very carefully at the proposals which we have made in the White Paper for the constitution of the Federal Legislature and of the Provincial Legislatures, and if they analyse I think they will agree with me that it will be almost impossible, short of a

land slide, for the extremists to get control of the Federal centre. I believe that to put it at the lowest, it will be extremely difficult for them, to get a majority in a province like Bengal."

কিন্তু তাহা বুঝিয়াও কংগ্রেসের পরিচালকগণ ইহা প্রতিরোধ না করিবার নীতি গ্রহণ করেন এবং কুখ্যাত "না গ্রহণ না বর্জ্জন" সিদ্ধান্ত রচিত হয়। ইহা প্রকারান্তরে বিপদের সময় বাঙ্গলা প্রদেশকে একক ত্যাগ করিবারই সামিল। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা যে ইহার সম্পূর্ণ সুযোগ লইয়াছে ১৯৩৫ সালের শাসনতন্ত্র রচনার বিবরণে তাহার প্রমাণ রহিয়াছে। ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইন যৎকালে পার্লামেণ্টারী জয়েণ্ট কমিটী কর্ত্তৃক বিবেচিত হইতেছিল তৎকালে কমিটী কর্ত্তৃক সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত পুনর্ব্বিবেচিত ও সংশোধিত হইবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছিল কিন্তু ১৯৩৪ সালের অক্টোবর মাসে কংগ্রেসের বোম্বাই অধিবেশনে সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে "না গ্রহণ না বর্জ্জন" প্রস্তাব অনুমোদিত হওয়ায় পার্লামেণ্টারী কমিটী সে সংকল্প ত্যাগ করেন। বস্তুতঃ ইহার পরের অধিবেশনেই কমিটী নিম্নলিখিত মন্তব্য করিয়াছেন—

"It is clear to us that there is among almost all the communities in India (not excepting the Hindu) a very considerable degree of acquiescence in the Award in the absence of any solution agreed between the communities. (পৃঃ ৬৭)

অর্থাৎ কমিটীর মতে ভারতের সকল সম্প্রদায় (হিন্দুরাও) উক্ত সিদ্ধান্ত মানিয়া লইয়াছে। সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত ও তৎসম্বন্ধে কংগ্রেসের মনোভাবের বিরুদ্ধে বাঙ্গলাদেশের প্রতিবাদ স্মরণীয় ঘটনা। ইহার ফলে শেষ পর্য্যন্ত কংগ্রেসকে, কার্য্যতঃ ইহার প্রতিরোধে কিছু না করিলেও, পূর্ব্ব মনোভাবের

পরিবর্ত্তন স্বীকার করিতে হইয়াছে *। এই বিষয়ে কংগ্রেসের অযৌক্তিক মনোভাব পরিবর্ত্তন করিয়া সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত বর্জ্জনের নীতি প্রতিষ্ঠায় বাঙ্গলাদেশের সার্থক প্রয়াসের গৌরবময় ইতিহাস স্বতন্ত্রভাবে আলোচনার যোগ্য। এখানে উল্লেখমাত্র করিয়াই ক্ষান্ত হইলাম।

সমসাময়িক ও অত্যন্ত সন্নিহিত পরবর্ত্তীকালের কয়েকটী ব্যাপারও এই আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হইবার যোগ্য। প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য পরিস্ফুট ও সপ্রমাণ করিবার পক্ষে এগুলি উপযুক্ত পটভূমিকার কার্য্য করিতে পারে। কিন্তু সে আলোচনার সময় বা অবসর নাই। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বাঙ্গালী-বিহারী সমস্যার মধ্য দিয়া বিহারবাসী বাঙ্গালীদের প্রতি তথাকার অবাঙ্গালীদের বিরুদ্ধ মনোভাব প্রকাশ এবং বিহারের কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ কর্ত্তৃক সেই বিরুদ্ধ মনোভাবের প্রশ্রয় ও পোষকতা। ফলে বহু অবাঙ্গালী বিহারী অপেক্ষা বিহারের দীর্ঘতর কালের বাসিন্দা হইলেও বাঙ্গালীদের উপর তথাকার গবর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক উৎপীড়নকারী ব্যবস্থার প্রয়োগ এবং বিহারে কংগ্রেস মন্ত্রীমণ্ডলের আমলেই সেই উৎপীড়নের চরম প্রকাশ। বিহার-প্রবাসী বাঙ্গালীদের মুখপাত্রস্বরূপে শ্রীযুত প্রফুল্লরঞ্জন দাস ইহার প্রতিবাদে অগ্রসর হন এবং প্রধানতঃ তাঁহারই চেষ্টার ফলে এই বাঙ্গালী-বিরোধী নীতি শেষ পর্য্যন্ত কিছুটা সংযত হয়। ইহাও সমগ্রভাবে একটী স্বতন্ত্র আলোচনার বস্তু। এক্ষেত্রে আলোচিত না হইলেও উল্লেখ করিয়া রাখিবার যোগ্য ইয়ুরোপ-প্রবাসকাল হইতে সুভাষচন্দ্রের সহিত তৎকালীন কংগ্রেসকর্ত্তৃপক্ষের ব্যবহার ও পরবর্ত্তী ইতিহাস।

কংগ্রেসের সুদীর্ঘকালের ইতিহাস গঠনে বাঙলার দান কতখানি তাহা প্রবন্ধ-বিশেষে বা পুস্তিকা বিশেষে প্রকাশ সম্ভব নহে। এইরূপ সংক্ষিপ্ত রচনার স্বল্পপরিসরের মধ্যে তাহার ইঙ্গিত দেওয়া চলে মাত্র। প্রায় অনুরূপ

* Congress Decision on Communal Award—Bengal Forces a Change By D. Chakrabarty & C. Bhattacharyya.

উদ্দেশ্য লইয়া প্রকাশিত অন্যান্য যে যে গ্রন্থ দেখিয়াছি তাহা হয় ঘটনা-সংগ্রহরূপে না হয় গোটা ইতিহাসের সার-সংক্ষেপরূপে রচিত হওয়ায় বাঙলার দানের দিকটা পরিস্ফুট হয় নাই, তাহা বিশেষ করিয়া পাঠকের মনকে অধিকারও করে না। তাহা করিতে হইলে যে শ্রমসাধ্য বিশ্লেষণ, যুক্তি ও ঘটনার মর্ম্মগ্রহণ আবশ্যক তাহারই সামান্য আভাস বর্ত্তমান রচনায় প্রকাশ পাইয়াছে। প্রবন্ধ-বিশেষের আলোচনা সংক্ষিপ্ত হইতে বাধ্য। ইহা যথাসম্ভব পূরণের জন্য মূল প্রবন্ধের পরে প্রকাশিত আর একটী প্রবন্ধ ইহার সহিত সংযোজিত হইল। প্রবন্ধটীকে সম্ভবমত পরিবর্দ্ধিত করা হইয়াছে। কিন্তু তাহাও যথেষ্ট হয় নাই। বাঙ্গলার কৃতিত্ব প্রমাণের জন্য অন্যান্য প্রদেশের সহিত যে তুলনামূলক আলোচনা প্রয়োজন তাহা সম্ভব হইল না। বস্তুতঃ উপযুক্তভাবে আলোচনা করিলে ইহাই একটা স্বতন্ত্র গ্রন্থ হইতে পারে।

রচনা পূর্ব্বেকার। যে আবেষ্টনের মধ্যে ইহা রচিত হইয়াছিল অদ্যকার আবেষ্টন তাহা হইতে বিভিন্ন। ইতিমধ্যে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছে যথাসাধ্য সংশোধন ও ফুটনোটের দ্বারা তাহার পরিচয় দিবার চেষ্টা করিয়াছি। তথাপি এই ভিন্নতর আবেষ্টনের মধ্যে ইহার কোনো কোনো অংশ হয়তো কিছুটা বিচিত্র বোধ হইতে পারে। তবে একটা কথা বলিতে হইবে। তৎকালে যাহা সিদ্ধান্ত করা হইয়াছিল পরবর্ত্তী ঘটনার দ্বারা তাহা কোথাও খণ্ডিত হয় নাই, পরন্তু প্রমাণিতই হইয়াছে। ১৯৩৫ সালের অবস্থায় যে সম্ভাবনা পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল ১৯৩৯ সালের ত্রিপুরী কংগ্রেসে ও তৎপরবর্ত্তী ব্যাপারে তাহাই পরিপূর্ণরূপে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে।

৬ই আশ্বিন, ১৩৫১
কলিকাতা

**শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য্য**

# সূচীপত্র
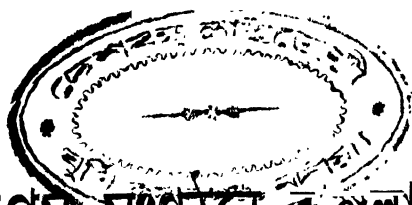
# কংগ্রেস সংগঠনে বাঙ্গলা

## কংগ্রেসের ঋণ

'কংগ্রেস আন্দোলনে বাঙ্গলার দান'—এইরূপ শিরোনামা দিয়াও প্রবন্ধ আরম্ভ করা চলিত। কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে ঋণ কথাটা ইচ্ছা করিয়াই ব্যবহার করা হইয়াছে। কংগ্রেস সংগঠনের আভ্যন্তরিক অবস্থা এখন যেরূপ তাহাতে বাঙ্গলার 'দানের' কথা বলিতে গেলে তাহার মর্য্যাদা উপলব্ধি হইবে কিনা জানিনা। সেইজন্য দানের কথা না বলিয়া দায়ের কথাটাই উঠাইলাম। বাঙ্গলার নিকট কংগ্রেসের 'দায়ের' কথাটা স্মরণ করিলে ও করাইলে কংগ্রেস ও বাঙ্গলাদেশ উভয়েরই পরস্পরকে উপলব্ধি করিবার সহায়তা হইবে। রাজনীতির বর্ত্তমান অবস্থায় তাহার প্রয়োজনও আছে।

তাই বলিয়া আত্মশ্লাঘা করা প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। যাহা ঘটে তাহা ঘটনাচক্রেই ঘটে—এই মস্ত বড় সত্যকথাটা ভুলিলে চলিবে না। কংগ্রেস আন্দোলনে বাঙ্গলার ত্যাগস্বীকারের প্রাচুর্য্য যদি ঘটিয়াই থাকে তাহা ঘটনাচক্রে ঘটিয়াছে। তবে এইটুকু মাত্র স্মরণ করাইবার দাবী করি যে, ঘটনাচক্রে ঘটিয়া থাকিলেও দানের নিজস্ব গুরুত্ব কমিয়া যায় না অথবা বাস্তবিক দায় অস্বীকার্য্য হইয়া পড়ে না। গঙ্গা যে হিমাচল-শিখর হইতে উদ্ভূত হইয়াছেন এবং পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছেন তাহা হয়তো ঘটনাচক্রেই, কিন্তু তাই বলিয়া গিরিরাজের অবিরল স্নেহধারার সিঞ্চনে ভারতভূমি যে স্নিগ্ধশ্যাম হইয়া উঠিয়াছে সে দানের গৌরব অস্বীকৃত হয় নাই। নৈশ অন্ধকারের আবরণ ভেদ করিয়া অরুণালোক যখন উদয়াচলে দেখা দেয়,

তখন পূর্ব্বদিকপ্রান্ত যে প্রথমেই উদ্ভাসিত হইয়া ওঠে তাহা অনিবার্য্য নিয়মেই ঘটিয়া থাকে; তথাপি, আলোকের নবঅভ্যুদয়কে প্রথম অভিনন্দিত করিবার যে গৌরব, প্রথমে জাগিবার এবং জাগরণ আনিবার যে আত্মপ্রসাদ, তাহা হইতে প্রাচীকে বঞ্চিত করা চলে না।

## বর্ত্তমান আলোচনার সীমানির্দ্দেশ

বর্ত্তমান প্রবন্ধের বিষয়বস্তু অধিকাংশই লেখকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বাহিরে। কংগ্রেসের ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধ অবস্থায় যাহা পাওয়া যায় তাহা অবলম্বন করিয়াই ইহা রচিত হইয়াছে। ঘটনা-পরম্পরার সবগুলিই যে পাওয়া গিয়াছে একথা নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব নহে। যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে যথাসম্ভব সঙ্গত সিদ্ধান্ত যাহা হয় তাহাই এখানে উপস্থিত করা হইল। যদি অন্য কোনো ঘটনা পরে পাওয়া যায় যাহার যোগাযোগে বর্ত্তমান সিদ্ধান্ত কোনরূপে পরিবর্ত্তনসাপেক্ষ বলিয়া প্রমাণিত হয় তাহাতেও আপত্তি করিবার কিছু নাই।

বিশেষ করিয়া স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, এই আলোচনা কংগ্রেসী রাজনীতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কংগ্রেসে বাঙ্গলার দান প্রচুর একথা সত্য, কিন্তু ভারতবর্ষের রাজনীতিকে সমগ্রভাবে বর্ত্তমান পরিণতিতে আনয়ন করিতে বাঙ্গালীর যাহা ত্যাগস্বীকার তাহার সমস্তটা কংগ্রেসের মধ্যে আবদ্ধ নহে—অনেকখানিই কংগ্রেসের বাহিরে পড়িবে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনে সর্ব্বাঙ্গীন জাগরণ আনিবার জন্য বাঙ্গালীর যে সাধনা, বিংশ শতাব্দীর প্রথমপাদে ভারতীয় রাজনীতিকে ভাঙ্গিয়া গড়িবার জন্য বাঙ্গালীর যে ত্যাগস্বীকার—সে কৃতিত্বের সবটা কংগ্রেসের ইতিহাসের মধ্যে আসিবে না। বাঙ্গালীর সে দুর্জ্জয় শক্তির স্ফুরণ কংগ্রেস-রঙ্গমঞ্চের বাহিরে সংঘটিত হইয়াছিল। সুতরাং সে কথা আলোচনার স্থান ইহা নহে। কংগ্রেস সংগঠন ও

কংগ্রেস আন্দোলনের উদ্ভব, অগ্রগতি ও বর্ত্তমান পরিণতি সাধনে বাঙ্গলার কৃতিত্ব কতটুকু তাহাই মাত্র এখানে আলোচনার বিষয়।

ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশও যে কংগ্রেসের জন্য যথাসম্ভব ত্যাগ-স্বীকার করিয়াছে সে কথাও এখানে স্বীকার্য্য। বস্তুতঃ কংগ্রেস আন্দোলনের প্রথম দিকটাতে মহারাষ্ট্র এবং বোম্বাই ইহার জন্য যথেষ্ট করিয়াছে, তাহার পরেই বোধ হয় মাদ্রাজ। কংগ্রেসে বাঙ্গালীর কৃতিত্বের কথা আলোচনা করার মধ্যে অন্যান্য প্রদেশের চিন্তা এবং কর্ম্মশক্তি অপেক্ষা কোনোরূপে শ্রেষ্ঠত্বাভিমান প্রদর্শনের কোনো কথা নাই। সকলেই স্ব স্ব কর্ম্মধারার অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে। নানা অপরিহার্য্য কারণে তাহাদের মধ্যে পার্থক্য দেখা দিয়াছে এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠার তারতম্য ঘটিয়াছে।

## বাঙ্গলার অগ্রগামিত্বের হেতু

যে সকল কারণে রাজনৈতিক, তথা অন্যান্য সকল আন্দোলনে বাঙ্গলা অগ্রগামী হইয়াছিল তাহাব মধ্যে প্রথম ও প্রধান কারণ হইল পাশ্চাত্য সভ্যতার সহিত প্রথম সংস্পর্শ-লাভ। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার সহিত ভারতীয় সভ্যতার সংঘাত বাঙ্গলাদেশেই প্রথম ঘটে, যুক্তিবাদী, জড়বাদী ও স্বাতন্ত্র্যবাদী পাশ্চাত্য চিন্তার আঘাতে বিশ্বাস-বাদী, অধ্যাত্মবাদী ও সমষ্টি-বাদী ভারতীয় মনের নব জাগরণের সূচনা বাঙ্গলাদেশেই দেখা দেয়; বাঙ্গলাদেশেই ইহার পুনরভ্যুদয়ের প্রারম্ভ। বাঙ্গলার অগ্রগামিত্বের দ্বিতীয় কারণ—বাঙ্গালীচিত্তের সচলতা, গ্রহণশীলতা এবং সহজাত সৃজনীশক্তি। এই বৈশিষ্ট্যের জন্যই স্বাধীনতা ও মানবতার দাবী সহজেই বাঙ্গালীর চিত্তকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল এবং উহার মধ্যে স্থায়ী ও অনুকুল আবেষ্টন পাইয়াছিল। সাধারণ ভারতীয় প্রকৃতি হইতে বাঙ্গালী প্রকৃতির পার্থক্য এই যে, বাঙ্গালীর নব নব উন্মেষ-শালিনী প্রতিভা আবহমানকাল পুরাতন ব্যবস্থাকে ভাঙ্গিয়া নূতন পথের সন্ধান

দিয়াছে এবং যুক্তির প্রাধান্য ও ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যের দিকে ঝুঁকিয়াছে। পশ্চিমের ইতিহাসের সুস্পষ্ট স্বাধীনতার বাণী বরণ করিয়া লইতে সেইজন্য বাঙ্গলাদেশ একটুও ইতস্ততঃ করে নাই। অধিকন্তু বাঙ্গালী মনোবৃত্তির অন্তর্নিহিত প্রচণ্ড আত্মাভিমান এই বাণী গ্রহণে ও প্রচারে সহায় হইয়াছিল। নূতন আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য যে সকল বে-হিসাবী ত্যাগস্বীকার করিয়া বাঙ্গলা প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে তাহার মূলে রহিয়াছে এই আত্মাভিমানের প্রেরণা ও শক্তি। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর হইতে যতীন্দ্রনাথ দাস পর্য্যন্ত—বিভিন্ন ক্ষেত্রে আত্মত্যাগী বাঙ্গালীর জীবনে—এই এক শক্তি ও প্রবৃত্তির প্রভাব ও প্রকাশ দেখিতে পাই। এই সহজাত কৌলীন্যবোধ, ঘটনার ও অবস্থার চাপে, বর্ত্তমানে যেন অনেকটা ম্লান হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু লোপ পায় নাই।

বাঙ্গলার অগ্রগতির তৃতীয় কারণ ছিল কলিকাতায় রাজধানীর অবস্থিতি। রাজধানী কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়াই কলিকাতাকে কেন্দ্র করিয়া প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে সংঘাত ঘটিয়াছিল এবং বাঙ্গালীর প্রতিভা ও ব্যক্তিত্ব সহস্রদল কমলের মত বিকসিত হইয়া উঠিবার সুযোগ পাইয়াছিল। সর্ব্ব-ভারতীয় নেতৃত্ব যে বর্ত্তমান যুগের প্রথম হইতেই বাঙ্গালীর করতলগত হইয়া পড়িয়াছিল তাহার কৃতিত্ব অনেকখানি কলিকাতা সহরের। আজ যে বাঙ্গালী তাহার পূর্ব্ব-মর্য্যাদা হইতে হঠিয়া গিয়াছে তাহার জন্য প্রভূত পরিমাণে দায়ী রাজধানী-স্থানান্তর। লর্ড কার্জ্জনের বঙ্গভঙ্গের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল কলিকাতার প্রাধান্য নষ্ট করা; কারণ, কার্জ্জন ঠিকই ধরিয়াছিলেন যে, কলিকাতার প্রাধান্য নষ্ট করিলেই বাঙ্গালীর প্রাধান্য আপনা হইতেই লোপ পাইবে। বঙ্গভঙ্গ রহিত হইয়াছে বটে, কিন্তু কার্জ্জনের উদ্দেশ্য যে প্রকারান্তরে সিদ্ধ হইয়াছে সেকথা আজ অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বঙ্গভঙ্গ রহিতের আনন্দের আতিশয্যে এই দারুণ অনিষ্টের ভবিষ্যৎ তখন আমরা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারি

নাই। বস্তুতঃ বাঙ্গলার প্রাধান্য ক্ষুণ্ণ হইবার মূলে রাজধানী-অপসারণের প্রভাব অনেকখানি। একটা আশ্চর্য্য ও উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই যে, গত ১৯৩৪ সালের বোম্বাই কংগ্রেসের প্রাক্কালে কোনো কোনো কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষ বাঙ্গলা হইতে কলিকাতাকে স্বতন্ত্র করিয়া লইবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। প্রস্তাবটী কার্য্যে পরিণত হইলে কার্জ্জনের কূটনীতির ফল যে সম্পূর্ণ হইত তাহাতে সন্দেহ নাই।

বাঙ্গালীর অনুকূলে চতুর্থ এবং শেষ কারণ হইল উচ্চ আদর্শের প্রতি তাহাদের স্বাভাবিক আকর্ষণ ও অনুরক্তি। এই আদর্শানুরাগই তাহাদের চিরকাল বৃহত্তর ও শ্রেষ্ঠতর পরিণতির দিকে লইয়া গিয়াছে। ইংরাজ-সাম্রাজ্যের সর্ব্বগ্রাসী আচ্ছাদনের মধ্যে বদ্ধ থাকিয়াও বাঙ্গালীর চিন্তা পূর্ণ স্বাধীনতার অনুধাবন করিয়াছে এবং শেষ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষকে ইহা গ্রহণ করিতে বাধ্য করিয়াছে। বাঙ্গালীর মনে যে সময়ে পূর্ণ স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইয়াছে তখন অন্যান্য প্রদেশ পূর্ণ স্বাধীনতার কথা ভাবিতে বা কল্পনা করিতেও পারে নাই। অধিক দিনের কথা নহে ১৯২৮ সালের কলিকাতা কংগ্রেসও ইহা লইয়া গান্ধীজীর সহিত সুভাষ চন্দ্রের সংঘর্ষ ঘটিয়াছে।

## বর্ত্তমান বাঙ্গলার বিবর্ত্তন

রাজা রামমোহন রায়ের সময় হইতেই বর্ত্তমান ভারতীয় পুনরভ্যুদয়ের প্রারম্ভ ধরা হইয়া থাকে। ইহাও সর্ব্বজনস্বীকৃত যে, রাজাই বর্ত্তমান রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রবর্ত্তক। রাজা যে পশ্চিম হইতে স্বাধীনতার বার্ত্তা আনিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইতিহাসের দিক দিয়া দেখিতে গেলে ভারতবর্ষে রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের সূচনা হয় ১৮৫০ সালের কাছাকাছি—ইংরাজী শিক্ষার ফল প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে। রাজা রামমোহন যে আন্দোলনের সৃষ্টি ও পরিচালনা করিয়াছিলেন তাহা

প্রধানতঃ ধর্ম্মের ক্ষেত্রে ব্যক্তির অধিকার পুনরুজ্জীবনের আন্দোলন। এই স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাই ধর্ম্ম হইতে সমাজে এবং সমাজ হইতে রাষ্ট্রনীতিতে সংক্রমিত হইয়াছে। ব্যক্তির স্বাধীনতার দাবী শেষ পর্য্যন্ত জাতীয় স্বাধীনতার আন্দোলনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। এই জন্যই প্রথম হইতে আজ পর্য্যন্ত জাতীয় আন্দোলনে ব্রাহ্মমতাবলম্বীদের দান এত বেশী।

বাঙ্গালীর সমন্বয়মুখী অধ্যাত্মদৃষ্টি ধর্ম্ম, সমাজ ও রাজনীতিকে এক, অখণ্ড ও অঙ্গাঙ্গিভাবে দেখিয়াছিল—তাহাতেই পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগ ও গতায়াতের বাধা হয় নাই। এইজন্য বাঙ্গলার জাতীয় আন্দোলনের সমগ্র ইতিহাস লিখিতে গেলে মাত্র রাজনৈতিক ইতিহাস লিখিলে চলে না, সমাজে ও ধর্ম্মে ব্যক্তি-স্বাধীনতার যে দাবী দেখা দিয়াছিল তাহার সবগুলিকেই সে ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত করিতে হয়। কোন্‌খানে ঠিক একটা শেষ হইয়া আর একটা আরম্ভ হইয়াছে তাহার সীমারেখা চিহ্নিত করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। রেভারেণ্ড কৃষ্ণ বন্দ্যো ও কালীচরণ ব্যানার্জ্জী পরমভাগবত খৃষ্টান ছিলেন, কিন্তু রাজনীতি তাঁহাদের নিকট অস্পৃশ্য বা অপাংক্তেয় ছিল না—ভারতবর্ষের রাজনীতিতে তাঁহাদের দান নগণ্য নহে। স্বামী বিবেকানন্দ নব্য বেদান্তবাদ প্রচার করিয়াছিলেন—অথচ তাঁহার আন্দোলনের শক্তি ধর্ম্ম, সমাজ ও রাজনীতিকে সমানভাবে প্রভাবিত করিয়াছে; ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ছিলেন ধর্ম্ম-প্রচারকমাত্র কিন্তু তাঁহাকে বাদ দিয়া জাতীয়তার ইতিহাস রচনা করা চলে না। জাতীয় মুক্তির আন্দোলনের এই সমগ্রতা ও অখণ্ডতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন—

"বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সমাজ-সংস্কারের আন্দোলন কেশবচন্দ্রের ধর্ম্ম-সংস্কার প্রবর্ত্তনের সুবিধা করিয়া দিল এবং এই সংস্কারের ফলে চিত্তবৃত্তির

যে প্রসারলাভ হইল, তাহাতে কৃষ্ণদাস পাল প্রভৃতির রাজনৈতিক কর্ম্মপ্রচেষ্টার অভ্যুদয় সূচনা করিল।"

## রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রারম্ভ—প্রতিষ্ঠান গঠন

১৮৫১ সালে "বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন" কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্ত্তমান যুগের ভারতবর্ষে সর্ব্ব-ভারতীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বোধ হয় ইহাই প্রথম। ইহার সঙ্গে সঙ্গে বোম্বাই সহরে "বোম্বে প্রেসিডেন্সী এসোসিয়েশন" নাম দিয়া একটী প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছিল বটে কিন্তু উহা অল্প কয়েক বৎসর পরেই উঠিয়া যায়। বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ধনী, অভিজাত ও জমিদারবর্গের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান যুগের সর্ব্বপ্রথম বাগ্মী রামগোপাল ঘোষ, স্বাধীনচেতা সাংবাদিক এবং নীলকরের যম হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, নেতৃশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণদাস পাল প্রভৃতি ইহার উদ্যোগী ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

অভিজাতবর্গের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হইলেও বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন তৎকালে জনসাধারণের স্বার্থরক্ষার জন্য কম চেষ্টা করে নাই এবং সুদীর্ঘ ২৫ বৎসর কাল ইহাই ছিল সর্ব্বপ্রধান রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। শিক্ষা ও অন্যান্য আন্দোলনের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ লোকে রাষ্ট্রীয় অধিকার সম্বন্ধে যখন সচেতন হইয়া উঠিল তখনই মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সমাজ আপনাদের জন্য আরও সাধারণ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন অনুভব করিল। রাষ্ট্রীয় আন্দোলন ও কর্ম্মপ্রচেষ্টা যাহাতে অভিজাত শ্রেণী হইতে শিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে আসিয়া পড়ে তাহার জন্য ১৮৭৫ সালের শেষে কিম্বা ১৮৭৬ সালের গোড়ার দিকে 'অমৃতবাজার পত্রিকার' যুগল পরিচালক শিশিরকুমার এবং মতিলাল ঘোষ, রেভাঃ কৃষ্ণ বন্দ্যো, ডাঃ শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 'ইণ্ডিয়ান লীগ' স্থাপন করেন। কিন্তু এই নূতন 'লীগ' সক্রিয় হইয়া উঠিবার

পূর্ব্বেই অধিকতর গণতন্ত্রের অনুকূল উদ্দেশ্য লইয়া তৎকালীন ছাত্র ও যুব-সমাজের যুগল-নেতা সুরেন্দ্রনাথ ও আনন্দমোহন ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন স্থাপিত করেন। ১৮৭৬ সালের ১লা জুলাই ইহার উদ্বোধন হয়। আনন্দমোহনের চরিত্রমাধুর্য্য, প্রতিভা ও ধীশক্তি এবং সুরেন্দ্রনাথের প্রচণ্ড কর্ম্মশক্তিময় ব্যক্তিত্বের প্রভাবে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন দ্রুত বাড়িয়া উঠে এবং উহার চাপে ইণ্ডিযান লীগ আপনা হইতেই লোপ পায়।

বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন এবং ইণ্ডিয়ান লীগ নামে সর্ব্ব-ভারতীয় হইলেও কার্য্যতঃ প্রথম সর্ব্ব-ভারতীয় প্রতিষ্ঠান হইল এই ইণ্ডিয়ান এসোসিযেশন। ভারতবর্ষের বহুস্থলে, বিশেষ করিয়া উত্তর-ভারতে সুদূর লাহোর পর্য্যন্ত ইহার শাখা বিস্তৃত হয়।

## ১৮৭০—১৮৮০

এই দশ বৎসব জাতীয আন্দোলনের পক্ষে সুবর্ণ-যুগ। জাতীয়তা বলিতে যাহা বুঝায় এই সময়েই অথবা ইহার অব্যবহিত পূর্ব্ব হইতেই তাহার উদ্ভব, প্রচার ও প্রতিষ্ঠা। এই সময়েই দেখিতে পাই 'জাতীয়' মেলা বসিতেছে, 'জাতীয়' সঙ্গীত রচনা ও গান আরম্ভ হইয়াছে; 'জাতীয়' নাটকের অভিনয় হইতেছে; 'জাতীয়' সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 'ন্যাসন্যাল' কথাটার রাজনীতিক্ষেত্রে প্রবর্ত্তন বোধ হয় এই সময় হইতেই। যে জাতীয়তা বোধ হইতে "ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতি" কয়েক বৎসর পরেই সৃষ্ট হইয়াছিল এই সময় হইতেই তাহার জাগরণ এবং সে জাগরণ আনিবার গৌরব বাঙ্গলার। ইতিহাসের ইহা এক গৌরবময় অধ্যায়।

একটু অবান্তর হইলেও একটা ঘটনা এইখানে উল্লেখযোগ্য। ভারতীয় জাতীয়তার এই নব-জাগরণের সময় হিন্দু ও মুসলমানে কোনো পার্থক্য বা মতভেদ দেখা দেয় নাই। উভয়ে একসঙ্গে চলিতেই আগ্রহান্বিত ছিল একথা ধরিয়া লওয়া যায়। মুসলমানেরা এই আন্দোলনের বিরোধিতা

করেন নাই বরং সহানুভূতির ভাবই পোষণ করিতেছিলেন। কিন্তু ঠিক এই সময়েই (১৮৮০-৮১) প্যানইসলামের প্রচারক জামাল-উদ্দীন আফগানিস্থান হইয়া ভারতবর্ষে আসেন। তিনি মুসলমানগণকে এই হিন্দু-প্রবর্ত্তিত আন্দোলন হইতে দূরে সরিয়া থাকিবার পরামর্শ দেন। কলিকাতায় তিনি নবাব আব্দুল লতিফ, সৈয়দ আমির আলি প্রভৃতি শিক্ষিত ও পদস্থ মুসলমানগণের সহিত পরামর্শ করেন এবং তাঁহাদিগকে জাতীয় আন্দোলনে যোগ দিতে নিষেধ করেন। জামাল-উদ্দীনের উপদেশ নিষ্ফল না হইলেও সম্পূর্ণ কার্য্যকরী হইয়া উঠিতে প্রায় ৫ বৎসর লাগিয়াছিল। ১৮৮৫ সালেও দেখিতে পাওয়া যায় কলিকাতায় ন্যাশনাল কনফারেন্সের ২য় অধিবেশনে সেণ্ট্রাল মোহামেডান এসোসিয়েশনের তরফ হইতে আমীর আলি মহাশয় উদ্যোগী ছিলেন।

## হিউম সাহেবের আবির্ভাব

ইহারই অল্পকাল পরে রাজনীতিক্ষেত্রে উদারচেতা হিউম সাহেবের আবির্ভাব। ভারতীয়েরা সংঘবদ্ধভাবে রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভের জন্য অগ্রসর হয়, ইহা তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল। এই উদ্দেশ্যের প্রতি দেশের শিক্ষিত সমাজকে আকৃষ্ট করিবার জন্য ১৮৮৩ সালের ১লা মার্চ্চ তিনি "কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েটগণের প্রতি"—বলিয়া এক আবেদন প্রচার করেন*। রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে যোগ দিতে হইলে যে ত্যাগস্বীকারের প্রযোজন হয়, সেই ত্যাগস্বীকারের জন্য শিক্ষিত সমাজকে অনুপ্রাণিত করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। আবেদনের প্রসঙ্গে তিনি বলেন :—

"যদি দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের মধ্যে এমন দীনতা বা স্বার্থপরতা আসিয়া থাকে যে, তাঁহারা দেশের হিতার্থে কিছুমাত্র ত্যাগস্বীকারে সম্মত

* আসাম হইতে পাঞ্জাব পর্য্যন্ত সমগ্র উত্তর ভারত তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকাভুক্ত।

না থাকেন তাহা হইলে পরাধীন ও পদদলিত হইয়া থাকাই তাঁহাদের যোগ্য পুরস্কার। যে জাতি যেরূপ যোগ্যতা অর্জ্জন করে ঠিক সেইরূপ-ভাবেই তাহার শাসনতন্ত্র গড়িয়া ওঠে। আপনাদের জাতির মধ্যে আপনারা শিক্ষিত ও শ্রেষ্ঠ। আপনারা যদি স্বাধীনতা ও শাসনাধিকার লাভের জন্য ব্যক্তিগত স্বার্থসুখ ত্যাগ করিয়া সংগ্রামে অগ্রসর না হন তাহা হইলে বলিতে হইবে যাহারা আপনাদের অধিকারলাভের বিরোধী তাহাদের কথাই ঠিক—আর যাহারা আপনাদের হিতাকাঙ্ক্ষী তাহারাই ভ্রান্ত।……মানুষ যাহারা তাহারা কর্ম্মের দ্বারা আপনাদের মনুষ্যত্ব প্রমাণ করে। ইংরাজেরা আপনাদিগের অধিকার কাড়িয়া লইয়াছে বলিয়া অভিযোগ করা আপনাদের আর শোভা পায় না। আত্মত্যাগ ও স্বার্থ-বলিদানই স্বাধীনতালাভের একমাত্র উপায়—আপনারা যদি ইহা উপলব্ধি করিয়া এতদনুসারে কাজ করিতে প্রস্তুত না থাকেন তাহা হইলে ইংরাজেরা চিরকালই আপনাদের দেশে প্রভুত্ব ও আধিপত্য করিবে—তাহা আপনাদের কাছে যতই কটু লাগুক না কেন।"

এই আবেদনের ফলে "ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল ইউনিয়ন" নামে একটী সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার সম্বন্ধে মাত্র এইটুকু জানা যায়, ১৮৮৫ সালের ডিসেম্বরের যে সম্মেলন কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন রূপে গণ্য তাহা ন্যাশনাল ইউনিয়নের সম্মেলনরূপেই আহূত হয় এবং মার্চ্চ মাসেই এতদুদ্দেশ্যে আবেদন প্রচারিত হয়। কংগ্রেসের উদ্ভবের সঙ্গেই ইউনিয়নের অবসান।

তাহা হইলে ১৮৫০ হইতে ১৮৮৩ সাল পর্য্যন্ত দেখা গেল ক্রমান্বয়ে চারিটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সংগঠিত হইয়াছে—বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন, ইণ্ডিয়ান লীগ, ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন এবং ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল ইউনিয়ন। প্রকৃতপক্ষে ইহারা ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসেরই পূর্ব্বপুরুষ। এই চারিটী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রথম তিনটী গঠনের কৃতিত্ব সম্পূর্ণভাবে বাঙ্গালীরই প্রাপ্য—শেষেরটীতেও কলিকাতাই

অগ্রণী; তবে অন্যান্য প্রদেশের কিছু কিছু ভাগ ছিল। এখানে উল্লেখযোগ্য এই যে, উক্ত প্রতিষ্ঠানচতুষ্টয়ের মধ্যে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনই ছিল সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী ও সক্রিয়। ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল ইউনিয়ন প্রথম কংগ্রেস আহ্বান করিয়াছিল মাত্র; কিন্তু পুনঃপুনঃ প্রচারকার্য্যের দ্বারা রাজনৈতিক অধিকারের চেতনা জাগাইয়া এবং নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের অধিবেশন আহ্বান করিয়া ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনই কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছিল। এই কৃতিত্ব সমগ্রভাবে প্রাপ্য সুরেন্দ্রনাথ ও আনন্দমোহনের।

## আন্দোলনের দ্বিতীয় স্তর—রাষ্ট্রীয় সম্মেলন

সকল স্থানের প্রতিনিধি লইয়া নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের অধিবেশন করিবার ধারণাটা কোথা হইতে আসিল তাহাও অনুসন্ধানের বিষয়। চলিত ইতিহাস যাহা পাওয়া যায় তাহাতে নিম্নলিখিত সম্মেলনগুলি এই ধারণা সৃষ্টি করিবার কৃতিত্ব দাবী করে:—

(১) ভারত সরকারের দিল্লী সম্মেলন—১৮৭৭।

(২) কলিকাতায় আন্তর্জ্জাতিক প্রদর্শনী—১৮৮৪।

(৩) নিখিল ভারত থিয়োসফিক্যাল কন্‌ভেনসন, মাদ্রাজ—১৮৮৪।

১৮৭৭ সালেই সুরেন্দ্রনাথ রাজনৈতিক প্রচারকার্য্যে প্রথম বাহির হন এবং সমগ্র উত্তরভারত পরিভ্রমণ করেন। তাঁহার কম্বুকণ্ঠের আহ্বানে সকল প্রদেশের সকল শ্রেণীর লোক রাষ্ট্রীয় অধিকার দাবী করিতে একত্রিত হয়। রাজনীতির ক্ষেত্রে সমস্ত ভেদ অগ্রাহ্য করিয়া ভারতবাসী যে একত্রিত হইতে পারে তাহা সুরেন্দ্রনাথই সর্ব্বপ্রথমে প্রমাণ করেন। প্রচারকার্য্য সমাপ্ত করিয়া ফিরিবার পথে দিল্লী সম্মেলনে তিনি উপস্থিত হন। তথায় সরকারী উদ্যোগে সর্ব্ব-ভারতীয় সম্মেলন দেখিয়াই আপনাদের উদ্যোগে অনুরূপ রাষ্ট্রীয় সম্মেলন করিবার কথা সকলের মনে হয়। কলিকাতা আন্তর্জ্জাতিক

প্রদর্শনী ও থিয়োসফিক্যাল কন্‌ভেনসনের পক্ষে যে দাবী করা হয় তাহা অমূলক না হইলেও সম্পূর্ণ সমর্থনযোগ্য নহে। কারণ ১৮৮৩ সালেই সুরেন্দ্রনাথ ভারতের সকল স্থান হইতে প্রতিনিধি লইয়া কলিকাতায় ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কনফারেন্সের অধিবেশন করেন।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে শুধু রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান-গঠনে নহে, নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের অধিবেশন করিবার ধারণাটাও প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক হইতেই প্রথমে উদ্ভূত হইয়াছিল এবং কংগ্রেসের জন্মের দুইবৎসর পূর্ব্বেই দুইটী বাঙ্গালী যুবক, সুরেন্দ্রনাথ ও আনন্দমোহন উহা কার্য্যে পরিণত করিয়াছিলেন। এই দুইজনের সম্বন্ধ ও সহযোগ দেখিয়া মনে হয়—আনন্দমোহন ছিলেন বুদ্ধিশক্তি এবং সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন কর্ম্ম-শক্তি। ইহাদের উদ্যোগে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের পক্ষ হইতে এই সম্মেলন আহ্বান করা হয় এবং আলবার্ট হলে ১৮৮৩ সালের ২৮শে, ২৯শে ও ৩০শে ডিসেম্বর উহার প্রথম অধিবেশন বসে। সুরেন্দ্রনাথ ও আনন্দমোহনের ইচ্ছা ছিল যে, বাঙ্গলায় ন্যাশনাল কনফারেন্স দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া পরে ভারতের অন্যান্য স্থানে উহার অধিবেশন আহ্বান করিবেন।

১৮৮৪ সালে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কন্‌ফারেন্সের কোনো অধিবেশন হয় নাই কারণ এই বৎসর প্রচারকার্য্যের জন্য সুরেন্দ্রনাথের তৃতীয়বার ভারত-ভ্রমণ*। এই বৎসর ডিসেম্বরে মাদ্রাজে থিয়োসফিক্যাল কনভেনশনের অধিবেশন হয়। অধিবেশনের পর বিভিন্ন প্রদেশের ১৭জন প্রবীণ নেতা একত্র সমবেত হন। তাহাতে বাঙ্গলার পক্ষ হইতে নরেন্দ্রনাথ সেন ও মনোমোহন ঘোষ উপস্থিত ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথও

---

* শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগলের "মুক্তির সন্ধানে ভারত" গ্রন্থে (পৃঃ ১৫৮) ইহাকে সুরেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় ভারত ভ্রমণ বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ সুরেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় ভারতভ্রমণ ১৮৭৮ সালে।

তাঁহাদের সহিত একত্রিত হন। ১৮৮৫ সালের ডিসেম্বরে পুণায় সম্মেলন আহ্বান করিয়া তৎপূর্ব্ব মার্চ্চ মাসে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল ইউনিযন যে আবেদন প্রচার করেন এই নেতৃবৈঠকেই তাহাব সূচনা। কিন্তু এই অধিবেশনেব উদ্যোগিগণের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথকে লওয়া হয় নাই।

## কংগ্রেসের উদ্ভব

এইস্থলে একটা প্রশ্ন অপরিহার্য্য। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের উদ্যোগে ইতিমধ্যেই একটা নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সম্মেলন আরম্ভ হইয়াছিল। তৎসত্ত্বেও নেতৃবৃন্দ অপব একটী সম্মেলনের আয়োজন করিলেন কেন? কেনই বা উহার অধিবেশন রাজধানী কলিকাতায় না হইয়া সুদূর পুণায় আহূত হইল? কেনই বা এই অধিবেশনের উদ্যোগে প্রথম হইতে সুরেন্দ্রনাথকে লওয়া হয় নাই? এই তিন প্রশ্নের উত্তর একই—আবহমান-কাল ধরিয়া প্রচলিত প্রবীণ নবীনের দ্বন্দ্ব। সুরেন্দ্রনাথ ও আনন্দমোহন তখন ছাত্রসংঘ স্থাপিত করিয়াছেন এবং বাগ্মিতা ও ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে তৎকালীন ছাত্র ও যুবক সমাজ সুরেন্দ্রনাথের একনিষ্ঠ ভক্ত। এই সকল কারণে প্রবীণেরা তাঁহাকে বড় সুনজরে দেখিতেন না। উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ প্রবীণ নেতৃবৃন্দের নিকট তখন সুরেন্দ্রনাথ "Boys' Leader" ( ছোকরাদলের নেতা ), "Stormy Petrel" ( হৈচৈ-কারক ) ইত্যাদি আখ্যায় পরিচিত ছিলেন। বিশেষতঃ তিনি সিভিল সার্ভিস হইতে অপসারিত হওয়ায় শিষ্টসমাজের তাঁহার প্রতি সুদৃষ্টি ছিলনা, তাঁহাকে দলে লইলে গবর্ণমেণ্ট চটিবেন এ ভযও ছিল। সুতরাং সুরেন্দ্রনাথের ন্যাশনাল কনফারেন্সকে যে তাঁহারা স্বীকার করিয়া লইবেন না তাহা বলাই বাহুল্য, কারণ তাহাতে সুরেন্দ্রনাথের প্রাধান্যকেই স্বীকার করিয়া লওয়া হইত। তাঁহাদের সম্মেলনেও তাঁহারা সুরেন্দ্রনাথকে প্রাধান্য দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। কারণ তাহাতে সুরেন্দ্রনাথের বাগ্মিতায় জয়ী হইবার

সম্ভাবনা ছিল। অথচ কলিকাতায় সম্মেলন করিলে সুরেন্দ্রনাথকে বাদ দিয়া করিবার উপায় ছিল না। সেই জন্য তাঁহাদের পৃথক সম্মেলন করিতে হয় ও উহার অধিবেশন আহ্বান করিতে হয় কলিকাতা হইতে অন্যত্র। কিন্তু সুদূব পশ্চিমপ্রান্তে পুণা ছাড়া সম্মেলন আহ্বানের অন্য কোনো অনুকূল স্থান যে পাওয়া যায় নাই তাহার দ্বারা প্রমাণিত হয় ভারতবর্ষের অন্যত্র তখনও রাষ্ট্রীয় চেতনা তেমন সজাগ হইয়া উঠে নাই এবং মহারাষ্ট্রের জনমত জাগ্রত হইয়াছিল। এইজন্য পূর্ব্বে বলিয়াছি বাঙ্গলার পরই রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে সংঘবদ্ধ হইবার গৌরব মহারাষ্ট্রের।

প্রবীণ ও নবীনের এই দ্বন্দ্বের ফলে দেখিতে পাই, ১৮৮৫ সালের ডিসেম্বরে প্রায এক সময়ে ভারতবর্ষের দুই প্রান্তে দুইটী নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সম্মেলন বসিয়াছে—একটী সুরেন্দ্রনাথের ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কনফারেন্স কলিকাতায় (২য় অধিবেশন) ; অপবটী হিউম, উমেশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস বোম্বাই সহরে *। বোম্বাইয়ের সম্মেলন ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল ইউনিয়ন কর্ত্তৃক আহূত হইয়াছিল বলা হইয়াছে। বাস্তবিক ইহার নাম কি হইবে তাহা প্রথমে অনিশ্চিত ছিল। বহু জল্পনাকল্পনা এবং বহু তর্ক-বিতর্কের পব উহার কংগ্রেস নাম স্থির হয়।

## "বাঙ্গালী কংগ্রেস"

কংগ্রেসের এই প্রথম অধিবেশনে যুবক বাঙ্গলার রাজা সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন না বটে, কিন্তু বাঙ্গালীর উদ্যোগ যে উহার সাফল্যে প্রভূত পরিমাণে সাহায্য করিয়াছিল, তাহার প্রমাণ উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্ব। উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মনপ্রাণ দিয়া উহাতে

* অধিবেশন পুণায় আহূত হইলেও তথায় কলেরার প্রাদুর্ভাবের দরুণ বোম্বাইতে স্থানান্তরিত হয়। শেষের দিকে সভাপতি কর্ত্তৃক সুরেন্দ্রনাথ আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন কিন্তু তিনি যান নাই। কলিকাতা কনফারেন্সের উদ্যোগ তখন সম্পূর্ণ হইয়াছে।

প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং তাঁহারই প্রভাবে কংগ্রেসে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। জর্জ্জ ইউল সাহেব, যিনি পরে প্রেসিডেণ্ট হন, যুক্তপ্রদেশের জননায়ক পণ্ডিত অযোধ্যানাথ—ইঁহাদিগকে কংগ্রেসে যোগ দিতে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ই প্রবৃত্ত ও প্রণোদিত করিয়াছিলেন। কলিকাতা হাইকোর্টে তিনি তখন শ্রেষ্ঠ ব্যবহারাজীব। তাঁহার সেই সমগ্র শক্তি ও পদমর্য্যাদা কংগ্রেসের পরিপুষ্টিসাধনে নিযুক্ত হইয়াছিল।

উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বের ফলে কংগ্রেসের জন্য বাঙ্গালীদের যে আগ্রহ জাগিয়াছিল তাহা বহুগুণে বাড়িয়া গেল সুরেন্দ্রনাথের কংগ্রেসে যোগদানের ফলে। ১৮৮৫ সালে প্রথম কংগ্রেসে প্রবীণেরা সুরেন্দ্রনাথকে ঠেকাইয়া রাখিয়াছিলেন বটে কিন্তু ১৮৮৬ সালেই তাঁহাদের পরাজয় ঘটে। এই বৎসরে কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। সুরেন্দ্রনাথের সহযোগিতা ছাড়া উহাকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার কোনো উপায় ছিল না, কারণ ছাত্র ও যুবসমাজ তাঁহার নির্দ্দেশে উঠিত বসিত। সুতরাং নেতৃবৃন্দকে সুরেন্দ্রনাথের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে হয়। তিনিও ন্যাশনাল কনফারেন্স উঠাইয়া দিয়া কংগ্রেসে মিশিয়া যান। ইহার পর ১৯১৭ সাল পর্য্যন্ত, অর্থাৎ মডারেটগণ যে পর্য্যন্ত কংগ্রেস ত্যাগ না করেন, সুরেন্দ্রনাথ, ১৯১৩ সালের করাচী অধিবেশন ছাড়া, কংগ্রেসে বরাবরই উপস্থিত থাকিয়াছেন।

কংগ্রেসের প্রথম অবস্থায় বাঙ্গালীদের দান ও প্রভাব এত বেশী ছিল যে, ইউরোপীয়গণ এবং সরকার পক্ষ কংগ্রেসের আখ্যা দিয়াছিলেন "বাঙ্গালী কংগ্রেস"। ১৮৯০ সালের কলিকাতা কংগ্রেসেও দেখিতে পাই, ফিরোজ শা মেহতা স্বীয় সভাপতির অভিভাষণে বলিতেছেন :—

"We have managed to survive the grievous charge of being all Babus in disguise—আমরা সকলেই যে এক একটী ছদ্মবেশী 'বাবু' এই কঠিন অভিযোগ আমরা প্রায় কাটাইয়া উঠিয়াছি।"

১৮৭০—১৮৮০ সালে যেমন একটী যুগের সমাপ্তি নির্দ্দেশ করা হইয়াছে তেমনি ১৮৯০ সাল পর্য্যন্ত দশ বৎসরে আর এক যুগের সীমারেখা টানা যাইতে পারে। পূর্ব্বের যুগ ছিল জাতীয়তার উদ্বোধনের যুগ এবং দ্বিতীয় যুগকে অধিকার লাভের জন্য জাতীয় সংঘর্ষের প্রারম্ভের যুগ বলা যাইতে পারে। এই যুগেই বাঙ্গালী সিভিলিয়ান বিহারীলাল গুপ্তের চেষ্টায় ইলবার্ট বিল উত্থাপন ও তাহার ফলে ভারতবর্ষময় বিরাট আন্দোলন; ইহারই মধ্যে সুরেন্দ্রনাথের কারাদণ্ড ও তজ্জনিত প্রবল বিক্ষোভ এবং পুনরায় কারামুক্ত সুরেন্দ্রনাথের ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র বিজয় অভিনন্দন; ইহার মধ্যেই ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা। এই দুইটী যুগেই দেখিতেছি বাঙ্গালী অগ্রণী।

## সভাপতিত্বে ও পরিপুষ্টিসাধনে বাঙ্গালী

ফিরোজ শা মেহতা মহাশয়ের অভিমত সত্ত্বেও বলা যায় যে, "বাঙ্গালী কংগ্রেস" অর্থাৎ কংগ্রেসে বাঙ্গালী প্রভাব ১৯১৬ সাল পর্য্যন্ত অর্থাৎ সুরেন্দ্রনাথের কংগ্রেস ত্যাগের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অব্যাহত ছিল। ১৯১৬ সাল পর্য্যন্ত কংগ্রেসের ৩২টী অধিবেশনের মধ্যে ১২টীর সভাপতি বাঙ্গালী। ১৮৯৮ ও ১৮৯৯ সালের অধিবেশনে পর পর বাঙ্গালী সভাপতি—আনন্দমোহন বসু, রমেশচন্দ্র দত্ত। ১৯১৪, ১৯১৫, ১৯১৬ সালে পর পর বাঙ্গালী সভাপতি —ভূপেন্দ্রনাথ বসু, সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ ও অম্বিকাচরণ মজুমদার। আজকাল ইহা কল্পনা করা যায় না—সুভাষ বাবুর সভাপতিত্ব লইয়া যে পবিমাণ বাধার সৃষ্টি হইতেছে তাহাতেই বোঝা যায়। ১৯১৬ সালের পরে বাঙ্গালী সভাপতিরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন মাত্র একজন—দেশবন্ধু দাশ*। ১৯২৯

* প্রবন্ধ রচনার সময় পর্য্যন্ত তাহাই ছিল। তাহার পরে বহু চেষ্টায় এবং অনুরোধে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু সভাপতির পদে গৃহীত হন। ১৯৩৮ সালে গুজরাট, হরিপুরায় এই কংগ্রেসের অধিবেশন হয়।

সালে দেশপ্রিয় সেনগুপ্তের সভাপতিত্ব লাভের সম্ভাবনা হইয়াছিল বটে কিন্তু কেন তাহা কার্য্যতঃ শেষ পর্য্যন্ত ঘটিয়া উঠিল না তাহা পরবর্ত্তী কালে সিন্ধু প্রদেশের বিশিষ্ট কংগ্রেস-সেবী স্বামী গোবিন্দানন্দের বিবৃতিতে প্রকাশ পায়। লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের ( ১৯৩৬ ) সভাপতি নির্ব্বাচন সম্বন্ধে স্বামীজীর অভিমতের যে বিবরণ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার মধ্যেই ইহা উল্লিখিত হইয়াছে :—

> "করাচী, ডিসেম্বর ৭—করাচীর চরমপন্থী কংগ্রেস নেতা স্বামী গোবিন্দানন্দের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি বলেন যে তাঁহার মতে লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে শ্রীযুত সুভাষ চন্দ্র বসুই সভাপতি হইবার যোগ্যতম ব্যক্তি। শ্রীযুত বসুকে যদি সভাপতি করা না হয় তবে তাঁহার প্রতি বিশেষ অবিচার হইবে। লাহোর কংগ্রেসে পরলোকগত জে, এম, সেনগুপ্ত মহাশয়ের সভাপতি হইবার সম্ভাবনা ছিল; কিন্তু শেষ মুহুর্ত্তে পণ্ডিত জওহরলালকে আনিয়া সেনগুপ্তের স্কন্ধে দাঁড় করানো হয়। লক্ষ্ণৌতেও লাহোরেরই পুনরভিনয়ের চেষ্টা চলিয়াছে। আবার পণ্ডিত জওহরলালকে টানিয়া আনিয়া সুভাষ বাবুর পথরোধের ব্যবস্থা করা হইতেছে।"
>
> "আনন্দবাজার পত্রিকা" ১৪ই ডিসেম্বর, ১৯৩৫

## ১৯২৯ সালের নির্ব্বাচন ও দেশপ্রিয় সেনগুপ্ত

১৯২৮ সালের কলিকাতা কংগ্রেসেই দেশপ্রিয় সেনগুপ্তের অসাধারণ যোগ্যতা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। লাহোর কংগ্রেসের সভাপতি হইলে মৃত্যুর (১৯৩৩, জুলাই ২২) পূর্ব্বে তিনি অন্ততঃ কংগ্রেস-সভাপতিত্বের মর্য্যাদা পাইয়া যাইতেন। তিনি যে নির্ব্বাচিত হইতেন তাহাতেও কোনো

সন্দেহ নাই। কিন্তু কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানটী যাঁহারা করায়ত্ত করিয়া রাখিয়াছেন তাঁহাদের সম্পূর্ণ আয়ত্ত ও নিজস্ব নহেন এরূপ কাহাকেও সভাপতি হইতে দেওয়া তাঁহাদের অভিপ্রেত ছিল না। ১৯২৯ সালের সভাপতি নির্ব্বাচনে এক বিচিত্র ব্যাপার ঘটে। সভাপতির জন্য মনোনীতদিগের পক্ষে যখন বিভিন্ন প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সদস্যগণের ভোট লওয়া হয় তখন গান্ধীজী স্বয়ং মনোনীতদিগের মধ্যে ছিলেন। অপর দুইজনও ছিলেন গান্ধীজীর নিজস্ব, বল্লভভাই ও জওহরলাল। এক্ষেত্রে যাহা অপরিহার্য্য ফল তাহাই ঘটে। গান্ধীজীর অনভিমতে কেহ দাঁড়ান নাই এবং ভোটাধিক্যে গান্ধীজীই সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। নির্ব্বাচিত হইবার পর গান্ধীজী প্রত্যাহার করেন। সুতরাং কংগ্রেসের নিয়মানুসারে সভাপতির শূন্যপদ পূরণের ভার নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির উপর অর্পিত হয়। ১৯২৯ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর লক্ষ্ণৌতে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনে পণ্ডিত জওহরলালকে সভাপতি নির্ব্বাচিত করা হয়। ডাঃ পট্টভী সীতারামিয়ার "কংগ্রেসের ইতিহাসে" এই ঘটনার যে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় গান্ধীজীই পণ্ডিত জওহরলালকে সভাপতির আসনে বসাইতে সংকল্প করিয়াছিলেন। পণ্ডিত জওহরলাল স্বীয় আত্মজীবনীতে ( পৃঃ ১৯৪ ) এই ঘটনার যে বিবরণ দিয়াছেন তাহাতেও দেখা যায় ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনে শেষ মূহুর্ত্তে গান্ধীজী জওহরলালের নাম প্রস্তাব করেন ও উহা গ্রহণের জন্য চাপ দেন। বিস্মিত, বিরক্ত ও বিব্রত ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি অসহায়ভাবে উহা গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়।

## ১৯৩৬ সালের নির্ব্বাচন

বস্তুতঃ কংগ্রেসে গান্ধী-প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইবার পর সভাপতি মনোনয়ন ও সভাপতি নির্ব্বাচন গান্ধীজীর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অভিপ্রায়ক্রমেই

পরিচালিত হইয়াছে। কংগ্রেসের মধ্যে থাকিয়াই হউক বা উহার বাহিরে থাকিয়াই হউক, গান্ধীজী যেমন উহার কার্য্যপদ্ধতি প্রভাবিত করিয়াছেন তেমনি সভাপতি নির্ব্বাচনও তাঁহার দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছে। কংগ্রেসের পরিচালনশক্তি স্বীয় আয়ত্তের বাহিরে যাহাতে না গিয়া পড়ে গান্ধীজী সর্ব্বদা সে দিকে দৃষ্টি রাখিয়াছেন এবং এই উদ্দেশ্যে প্রয়োজনমত উহার গঠনতন্ত্রের পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। পণ্ডিত জওহরলালের প্রথম ও দ্বিতীয় নির্ব্বাচন সম্বন্ধে স্বামী গোবিন্দানন্দের অভিমত উদ্ধৃত করিয়াছি। ১৯৩৬ সালে তাঁহার দ্বিতীয়বার নির্ব্বাচন কি ভাবে সম্ভব হইয়াছিল ডাঃ পট্টভী সীতারামিয়া (যাঁহাকে পরে গান্ধীজীই সভাপতি পদের জন্য মনোনীত করিয়াছিলেন) তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের অধিবেশন (এপ্রিল ১২-১৪) হইয়া যাইবার পর ২১শে এপ্রিল মসুলীপত্তমে এক জনসভায় ডাঃ পট্টভীর বক্তৃতার যে বিবরণ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল তাহাতে তিনি বলিতেছেন :—

> "পণ্ডিত জওহরলাল যখন বিলাতে ছিলেন সেই সময় তাঁহার ও পূর্ব্বোক্ত (মন্ত্রিত্বগ্রহণকামী ও মন্ত্রিত্বগ্রহণ-বিরোধী) দল দুইটীর মধ্যে গোপনে পত্রের আদান প্রদান চলিতেছিল। সেই পত্রালাপে স্পষ্টভাবেই জানানো হইয়াছিল যে তিনি (পণ্ডিত জওহরলাল) মন্ত্রিত্ব গ্রহণের বিরোধী। এই অবস্থাতে গান্ধীজী কংগ্রেস সভাপতি-পদের সকল প্রার্থীর নিকট পত্র লিখিয়া নির্ব্বাচনের ক্ষেত্র হইতে সরিয়া যাইতে এবং সভাপতির পদ পণ্ডিত জওহর-লালকে ছাড়িয়া দিতে বলেন। ইহাও প্রকাশ যে, পণ্ডিত জওহরলালকে সভাপতি নির্ব্বাচনের জন্য গান্ধীজী কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন এমন কি প্রচারকার্য্যও চালাইয়াছিলেন।"

"অমৃতবাজার পত্রিকা" ২৬শে এপ্রিল, ১৯৩৬

১৯৩৬ সালের লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের অধিবেশন পর্য্যন্ত অর্থাৎ পণ্ডিত জওহরলাল কর্ত্তৃক নূতন ওয়াকিং কমিটী গঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত ডাঃ পট্টভী ওয়ার্কিং কমিটীর সদস্য ছিলেন। সুতরাং আভ্যন্তরীণ ব্যাপার তিনি যে সমস্ত জানিতেন তাহা নিঃসন্দেহ *।

## গান্ধীজী ও সুভাষচন্দ্র

১৯৩৬ সালের কংগ্রেসে সুভাষবাবুর সভাপতি হইবার যে বিশেষ সম্ভাবনা ছিল স্বামী গোবিন্দানন্দের পূর্ব্বোক্ত বিবৃতি হইতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু গান্ধীজীর অভিপ্রায় যে অন্যরূপ ছিল তাহা ডাঃ পট্টভীর বক্তৃতা হইতে পাইতেছি। সুভাষবাবু রাজনৈতিক মতে গান্ধীজীর সম্পূর্ণ অনুবর্ত্তী ছিলেন না এবং তাহা প্রকাশ করিতেও তিনি ইতস্ততঃ করেন নাই। পণ্ডিত জওহরলাল যে ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত অভিমতে গান্ধীজীর বিরুদ্ধবাদী হইয়াও শেষ পর্য্যন্ত আত্মসমর্পণ করিয়াছেন সুভাষবাবু সে ক্ষেত্রে শেষ পর্য্যন্ত ব্যক্তিগত অভিমতের দৃঢ়তাই রক্ষা করিয়াছেন। ১৯২৮ সালের কলিকাতা কংগ্রেসে নেহেরু রিপোর্ট সম্পর্কীয় প্রস্তাবে এবং ১৯২৯ সালে কংগ্রেসের অধিবেশনের পূর্ব্বে লর্ড আরুইনের প্রস্তাবিত গোল

---

* ডাঃ পট্টভীর মতে গান্ধীজী স্বয়ং মন্ত্রিত্বগ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন, সুতরাং পণ্ডিত জওহরলালের মুখ বন্ধ করিবার জন্যই এই ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। যদিও ইহা এক্ষেত্রে আলোচনার বিষয় নহে তথাপি স্বামী গোবিন্দানন্দের পূর্ব্বোক্ত বিবৃতিতেও যে ঠিক অনুরূপ অনুমানই করা হইয়াছে তাহা উল্লেখযোগ্য। স্বামীজী বলেন :—

> "পণ্ডিত জওহরলালের মস্তকে কংগ্রেসের মুকুট তুলিয়া দিয়া কৌশলে তাঁহার মুখ বন্ধ করা ভিন্ন আর কিছুই নহে। একবার দায়িত্ব গ্রহণ করিলে বাধ্য হইয়াই তাঁহার নিজস্ব মত কংগ্রেসের প্রবীণ নেতাদের মতের নিকট তাঁহাকে বিসর্জ্জন দিতে হইবে।"

বস্তুতঃ ডাঃ পট্টভী এবং স্বামী গোবিন্দানন্দের অনুমান সত্যেই পরিণত হইয়াছিল।

টেবিল বৈঠকে সহযোগিতার সর্ত্ত নির্দ্ধারণ করিয়া যে বিবৃতি প্রকাশ কবা হয় তাহাতে স্বাক্ষর ব্যাপাবে ইহা বিশেষভাবে প্রমাণিত হয়। ১৯২৮ সালের কংগ্রেসে গান্ধীজী নেহেরু রিপোর্ট গ্রহণের প্রস্তাব উত্থাপন করিলে তাহার সংশোধক স্বরূপে সুভাষবাবু এবং পণ্ডিত জওহরলাল উভয়ে পূর্ণস্বাধীনতার প্রস্তাব উত্থাপন করেন কিন্তু গান্ধীজীর চাপে পণ্ডিত জওহরলাল বিষয় নির্ব্বাচনী সমিতিতে ভোট গ্রহণের দিন অনুপস্থিত হন এবং কংগ্রেসের অধিবেশনে সুভাষবাবুর প্রস্তাব সমর্থন করিয়াও ভোটদানে নিবপেক্ষ থাকেন ; সুভাষবাবু শেষ পর্য্যন্ত প্রস্তাবের পক্ষে থাকিয়া গান্ধীজী ও পণ্ডিত মতিলালের সহিত প্রত্যক্ষ সংঘষেব দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং প্রকাশ্য কংগ্রেসে গান্ধীজীর তিরস্কারের ভাগী হন। ১৯২৯ সালের পূর্ব্বোক্ত বিবৃতি প্রকাশিত হয কংগ্রেস ও অন্যান্য পক্ষের সমবেত দাবী হিসাবে। উহাতে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী বর্জ্জন কবিয়া ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস স্বীকাব করিযা লওযার ফলে সুভাষচন্দ্র ও জওহরলাল উভয়েই বিরুদ্ধবাদী হন। কিন্তু গান্ধীজীব চাপে শেষ পর্য্যন্ত জওহবলাল উহাতে স্বাক্ষর কবেন, সুভাষ-চন্দ্র স্বাক্ষব করেন নাই। সুভাষবাবুকে কংগ্রেসের কর্ত্তৃত্বপদ দিতে গান্ধীজীর অনিচ্ছা ব্যক্তিগত আলোচনায় তিনি পুনঃপুনঃ প্রকাশ করিয়াছেন।

১৯৩৬ সালে সুভাসবাবু সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলে সঙ্গতি এবং যোগ্যতার সম্মান যেমন রক্ষিত হইত তেমনি অপর একটা বিশেষ উদ্দেশ্য সাধিত হইবারও সম্ভাবনা ছিল। ১৯২৪ সালে গ্রেপ্তার ও বিনা বিচারে আটক হইয়া ১৯২৭ সালে সুভাষবাবু মুক্তি পান। পুনরায় ১৯৩০ সালের জানুয়ারী মাসে রাজদ্রোহের অপরাধে ৯ মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া সেপ্টেম্বর মাসে মুক্তি পান। ১৯৩১ সালের জানুয়ারী মাসে স্বাধীনতা দিবসের শোভাযাত্রায় গ্রেপ্তাব হইয়া উক্ত বৎসরেব ৮ই মার্চ্চ গান্ধী আরুইন চুক্তির ফলে মুক্তি পান। তাহার পব ১৯৩২ সালের আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ হইবার প্রাক্কালে ২রা জানুযারী ৩নং রেগুলেশনে

আটক হন। আটক অবস্থায় পীড়িত হইয়া পড়িলে ১৯৩৩ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারী ভারতবর্ষ হইতে বাহিরে নির্ব্বাসনের সর্ত্তে মুক্তি পান। ইউরোপে সুদীর্ঘ নির্ব্বাসন-জীবন যাপন করিয়া তিনি শেষ পর্য্যন্ত সরকারী নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তনের সংকল্প প্রকাশ করেন এবং ১৯৩৬ সালের ৮ই এপ্রিল ঠিক লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের প্রাক্কালে ভারতবর্ষে উপনীত হইলে সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হয়। লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে তাঁহাকে নির্ব্বাচনে যাঁহারা উদ্যোগী হইয়াছিলেন সুদীর্ঘ কারাবাস, নির্ব্বাসন, ব্যক্তিগত যোগ্যতা ছাড়া অপর একটা লক্ষ্যও তাঁহাদের ছিল। অনেকেরই বিশ্বাস ছিল যে কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়া যদি তিনি দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন তাহা হইলে হয় তো তাঁহাকে পুনরায় গ্রেপ্তার করা হইবে না। সুভাষবাবুকে সভাপতি নির্ব্বাচনের জন্য যাঁহারা গান্ধীজীকে অনুরোধ করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র, রামানন্দ বাবু এবং এণ্ড্রুজ সাহেব। কিন্তু কাহারও অনুরোধ ফলপ্রসূ হয় নাই। এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে পণ্ডিত জওহরলালকে সভাপতি করিতে কংগ্রেসের সুদীর্ঘকালের প্রথা ভঙ্গ করিতে হইয়াছিল। যে প্রদেশে কংগ্রেসের অধিবেশন হইবে সেই প্রদেশের কেহ উহার সভাপতি হইতে পারিবেন না এই প্রথা কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা অবধি প্রচলিত হইয়াছিল কারণ একই ব্যক্তি একই সময়ে আতিথ্য গ্রহণ ও অতিথি সৎকার দুই কাজ একত্রে করিতে পারেন না। লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসেই কেবল ইহা ভঙ্গ করা হয়।

## ১৯৩৩ সালের কংগ্রেস ও শ্রীমতী নেলী সেনগুপ্তা

১৯৩৩ সালে কংগ্রেসের দুর্দ্দিনে দেশপ্রিয়-গৃহিণী শ্রীমতী নেলী সেনগুপ্তা সভাপতিত্বের বিপদ বরণ করিয়া লইয়াছিলেন কিন্তু কংগ্রেসের

সভাপতির তালিকায় তাঁহার নাম গৃহীত হয় নাই। ইহাও এক বিচিত্র ব্যাপার এবং উল্লেখ করিবার ও স্মরণ রাখিবার যোগ্য। ইহা সম্পূর্ণ অনুধাবন করিতে হইলে পূর্ব্ব ইতিহাস কিছুটা উল্লেখ করিতে হয়। ১৯৩২ সালের জানুয়ারী মাসে গান্ধীজী আইন অমান্য আন্দোলন প্রবর্ত্তন করিলে কংগ্রেস বে-আইনী ঘোষিত হয় এবং ইহার কার্য্যকলাপ নিষিদ্ধ হয়। এই নিষেধাজ্ঞার মধ্যেই কংগ্রেসের দুইটী বাৎসরিক অধিবেশন হয়—১৯৩২ সালের ২৪শে এপ্রিল তারিখে দিল্লীতে এবং ১৯৩৩ সালের ৩১শে মার্চ্চ তারিখে কলিকাতায়। দুইটীর আয়োজনই করিতে হইয়াছিল পুলিশের দৃষ্টি এড়াইয়া এবং দুইটী অধিবেশনই ব্যর্থ করিবার জন্য ও ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য পুলিশ যথাসাধ্য চেষ্টা করে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও উভয় অধিবেশনেই সদস্যগণ সমবেত হন এবং যথারীতি প্রস্তাবাদি গৃহীত হয়। দিল্লীর অধিবেশন হইয়াছিল চাঁদনীচকে ঘড়িঘরে এবং কলিকাতায় অধিবেশন হইয়াছিল এস্‌প্লানেডে ট্রাম কোম্পানীর যাত্রীদের বিশ্রাম-স্থলে। দিল্লীর অধিবেশন-স্থানের সন্ধান পুলিশ পায় নাই, পুলিশ আসিবার পূর্ব্বেই অধিবেশন সমাপ্ত হয়। কলিকাতা অধিবেশনে শেষ পর্য্যন্ত পুলিশ উপস্থিত হইয়া লাঠি চালায় এবং সেই লাঠি চালনার মধ্যেই সদস্যগণ কংগ্রেসের কার্য্য সম্পূর্ণ করেন।

পরপর এই দুইটী অধিবেশনেই সভাপতিত্ব করিবার কথা হইয়াছিল পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়জীর। কিন্তু কোনোটীতেই তিনি কার্য্যতঃ সভাপতিত্ব করিতে পারেন নাই, কারণ দিল্লী ও কলিকাতায় পৌঁছিবার পথেই তাঁহাকে গ্রেপ্তার ও কারারুদ্ধ করা হয়। দিল্লীতে সভাপতিত্ব করেন আহমদাবাদের শেঠ রণছোড়দাস অমৃতলাল এবং কলিকাতায় সভাপতিত্ব করেন দেশপ্রিয় সেনগুপ্তের গৃহিণী শ্রীমতী নেলী সেনগুপ্তা। তাঁহার স্বামী তখন ৩নং রেগুলেশনে বন্দী এবং তাঁহার নিজের উপর

ব্যক্তিগত ভাবে নিষেধাজ্ঞা জারী হইয়াছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও পণ্ডিতজীর গ্রেপ্তারের পর তিনি নিষেধাজ্ঞা অগ্রাহ্য করিয়া সভাপতিত্বের দায় স্বীকার করেন এবং লাঠিচালনার মধ্যে অধিবেশনের কার্য্য সম্পাদন করিয়া গ্রেপ্তার হন।

আশ্চর্য্য এই, কংগ্রেসের সভাপতির তালিকায় শেঠ রণছোড়দাসের ও শ্রীমতী সেনগুপ্তার নাম গৃহীত হয় নাই। কংগ্রেসের আইন অমান্য আন্দোলন ক্ষান্ত হইবার পর ১৯৩৪ সালের মে মাসে পাটনায় নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির প্রথম অধিবেশনে শ্রীমতী সেনগুপ্তা সভাপতিত্ব করিতে আহুত না হওয়াতেই ব্যাপারটা প্রকট হইয়া ওঠে। ইহার পর শ্রীমতী সেনগুপ্তার নাম যাহাতে অন্ততঃ কংগ্রেস সভাপতির তালিকায় গৃহীত হয় এবং পূর্ব্ব সভাপতি হিসাবে পদাধিকারে ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির স্থায়ী সভ্য বলিয়া তিনি পরিগণিত হন তজ্জন্য ১৯৩৬ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর পক্ষ হইতে পরলোকগত ধীরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী উদ্যোগী হইয়া তৎকালীন সভাপতি পণ্ডিত জওহরলালের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন কিন্তু এ বিষয়ে যে পত্রালাপ হয় তাহাতে পণ্ডিত জওহরলাল নির্দ্দেশ দেন যে শ্রীমতী সেনগুপ্তা পণ্ডিত মালবীয়ের স্থলবর্ত্তিস্বরূপে কার্য্য করিয়াছেন মাত্র, সভাপতিত্বের অধিকার তাঁহার নাই। ওয়ার্কিং কমিটীর প্রস্তাবেও অনুরূপ অভিমত প্রকাশিত হয় (১৯৩৬, আগষ্ট ২০-২৩)। ১৯২১ সালের আমেদাবাদ কংগ্রেসের নির্ব্বাচিত সভাপতি দেশবন্ধু দাশের স্থলবর্ত্তিরূপে কার্য্য করিয়া হাকিম আজমল খাঁ সভাপতির তালিকায় গৃহীত হইয়াছেন। কিন্তু ১৯৩২ বা ১৯৩৩ সালের বিপদের মধ্যে যাঁহারা সভাপতিত্ব করিলেন তাঁহারা সে তালিকায় স্থানলাভ করিলেন না! ১৯২১ সালের নির্ব্বাচিত সভাপতি দেশবন্ধু দাশ গ্রেপ্তার হইলে শূন্যপদ পূরণের জন্য নিয়মানুযায়ী কোনো নির্ব্বাচন হয় নাই, ১০ই ডিসেম্বর দেশবন্ধু গ্রেপ্তার হন এবং ২৩শে ডিসেম্বর ওয়ার্কিং কমিটী

নির্দ্দেশ দেন যে হাকিম সাহেব সভাপতির স্থলবর্ত্তিরূপে কাজ করিবেন[১]। ২৭শে ডিসেম্বর কংগ্রেসের অধিবেশন আরম্ভ হয়। ১৯৩২ ও ১৯৩৩ সালে কংগ্রেস বে-আইনী সুতরাং প্রকাশ্য নির্ব্বাচন সম্ভব ছিল না। কিন্তু যে ভাবে এবং যাঁহাদের দ্বারা পণ্ডিত মালবীয় সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন ঠিক সেইভাবে এবং তাঁহাদের দ্বারাই শেঠ রণছোড়দাস ও শ্রীমতী সেনগুপ্তা শূন্যপদ পূরণের জন্য নির্ব্বাচিত হন। তথাপি তাঁহারা সভাপতির তালিকায় গৃহীত হইলেন না ইহা রহস্য ও বিস্ময়ের বিষয়[২]।

---

১ Seven months with Gandhiji-Krishnadas Vol II. p. 227.

২ বস্তুতঃ কংগ্রেস হাই কমাণ্ডের আচরণ দেখিয়া মনে হয় ১৯৩২ ও ১৯৩৩ সালের অধিবেশনদ্বয়কে কংগ্রেসের অধিবেশন বলিয়া স্বীকার করাই তাঁহাদের অভিপ্রায় ছিল না। সম্ভব হইলে তাঁহারা এই দুইটী অধিবেশন একেবারে গণনার মধ্যেই আনিতেন না। কিন্তু তাহা সম্ভব হয় নাই। কারণ ১৯৩২-৩৩ সালে নিষেধাজ্ঞার মধ্যে যাঁহারা কংগ্রেসের সাধারণ কার্য্য চালাইয়াছিলেন ১৯৩৪ সালে নিষেধাজ্ঞা অপসারিত হইলে কংগ্রেসের উক্ত দুই বৎসরের কার্য্যবিবরণী উপস্থাপিত করেন তাঁহারাই এবং এই বিবরণীতে তাঁহারা উক্ত দুইটী অধিবেশনকে গণনা করিয়া মুদ্রিত কার্য্য বিবরণীর মধ্যে উহাদের বিবরণও উল্লেখ করেন। এই ভাবে এই দুইটী অধিবেশন অধিবেশন-সংখ্যার অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়। সুতরাং কর্ত্তৃপক্ষ ইহা স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হন। কিন্তু গণনার অন্তর্ভুক্ত হইলেও পরবর্ত্তিকালে কার্য্যতঃ এই দুই অধিবেশনকে অস্বীকার করা হইয়াছে। ১৯৩৫ সালে ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস জুবিলী অনুষ্ঠানের যে বিবরণ কংগ্রেসের সরকারী বুলেটীনে প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে পূর্ব্ব সভাপতির তালিকা রচনায় ১৯৩১ সালের করাচী অধিবেশন পর্য্যন্তই লওয়া হইয়াছে। পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়ই যদি ১৯৩২ ও ১৯৩৩ সালের সভাপতি বলিয়া গৃহীত হন তাহা হইলে সেকথা তাঁহার নামের সহিত উল্লেখ করা উচিত ছিল। কিন্তু পণ্ডিতজীকে মাত্র ১৯০৯ ও ১৯১৮ সালের সভাপতি বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। সম্ভবতঃ ইহারই অনুসরণ করিয়া নটেশন কোম্পানী তাঁহাদের "কংগ্রেস সভাপতির অভিভাষণ" ২য় খণ্ডে সভাপতি ও অধিবেশনের তালিকায় ১৯৩২ ও ১৯৩৩ সালের অধিবেশন বাদ দিয়াছেন। ১৯৩১ এর পর একেবারে

দেশবন্ধুর জীবনকালে তিনি কংগ্রেসে স্বীয় প্রাধান্য বজায় রাখিতে পারিয়াছিলেন অসাধারণ ব্যক্তিত্বের প্রভাবে। তাঁহার সেই অসাধারণ ব্যক্তিত্বের সহিত সংঘর্ষে গান্ধীজীকে পর্য্যন্ত "Defeated and Humbled"—"পরাভূত ও অবমানিত" বলিয়া ক্ষোভ প্রকাশ করিতে হইয়াছে। * কিন্তু দেশবন্ধুর ব্যক্তিগত প্রাধান্য বজায় থাকিলেও কংগ্রেসের পরিচালন-ব্যবস্থায় (Congress Machinery) তিনি কোনো দখল পান নাই; উহা বহুপূর্ব্বেই, সম্ভবতঃ অসহযোগের সময় হইতেই, বাঙ্গালার আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া গিয়াছিল। এখন তাহা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে মাত্র। বর্ত্তমানে যে অবস্থা, তাহাতে আগামী অন্ততঃ ১০ বৎসরের মধ্যে কংগ্রেসে বাঙ্গলার কেহ প্রাধান্য পাইবে না একথা নিশ্চিতভাবে বলা চলে। বাঙ্গলা হইতে কেহ হয়ত সভাপতি হইতে পারেন—কিন্তু কংগ্রেস-পরিচালন ব্যবস্থায় কোনরূপ অধিকার পাইতে যথেষ্ট সময় লাগিবে। †

---

১৯৩৪ সালের বোম্বাই কংগ্রেসের সভাপতি বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। পক্ষান্তরে ডাঃ পট্টভী সীতারামিয়ার "কংগ্রেসের ইতিহাসে" এই দুই অধিবেশনের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে এবং সভাপতির তালিকায় ১৯৩২ সালে শেঠ রণছোড়দাস এবং ১৯৩৩ সালে শ্রীমতী সেনগুপ্তার নাম দেওয়া হইয়াছে। তাহা হইলে বিচিত্র ব্যাপার দাঁড়াইতেছে এই যে, ১৯৩২ ও ১৯৩৩ সালের অধিবেশন যদিই বা সংখ্যা গণনার মধ্যে লওয়া হইয়াছে এই দুই অধিবেশনের সভাপতি বলিয়া কাহার নাম গৃহীত হইবে তাহা এখনও অনিশ্চিত।

* এখানে ইহা উল্লেখযোগ্য যে গোপীনাথ সাহার সংক্রান্ত দেশবন্ধুর যে প্রস্তাব লইয়া ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতিতে গান্ধীজী ও দেশবন্ধুর এই সংঘর্ষ ঘটিয়াছিল এবং যাহাতে কংগ্রেসের মূলনীতি অহিংসা লঙ্ঘন করা হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা করিয়াও গান্ধীজী মাত্র সামান্য ভোটে জয়লাভ করেন ১৯৩১ সালের করাচী কংগ্রেসে গান্ধীজীর উপস্থিতিতে ও অনুমোদনক্রমে ভগৎ সিং সম্বন্ধে তাহার অনুরূপ প্রস্তাব গৃহীত হয়।

† ১৯৩৯ সালে ত্রিপুরী কংগ্রেসে সুভাষবাবু সভাপতি নির্ব্বাচিত হওয়ার পর যে ব্যাপার ঘটে তাহাই ইহার স্পষ্ট ও অখণ্ডনীয় প্রমাণ। ১৯৩৮ সালে সুভাষবাবু হরিপুরা কংগ্রেসের

## কংগ্রেসের প্রতি বাঙ্গালীর দরদ

কংগ্রেসের পরিপুষ্টি ও প্রসারে এবং কংগ্রেস আদর্শের অগ্রগতিতেও বাঙ্গলার দান প্রচুর। আদর্শের কথা স্বতন্ত্রভাবে আলোচিত হইবে। কংগ্রেসের পরিপুষ্টি ও প্রসারের কথা লওয়া যাউক। বাঙ্গলাদেশে যে কয়বার কংগ্রেসের অধিবেশন হইয়াছে প্রত্যেকবারই উহা আয়তনে বাড়িয়াছে। ১৮৮৫ সালের প্রথম অধিবেশনে উপস্থিত সভ্যসংখ্যা ছিল মাত্র ৭২ কিন্তু কলিকাতাতে পরবর্ত্তী অধিবেশনেই উহা বাড়িয়া ৪০৭ হয়। কংগ্রেস যে জন-প্রতিনিধি, তাহার সেই রূপ ১৮৮৬ সালে কলিকাতাতেই ফুটিয়া ওঠে। এই বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ১৮৮৬ সালের কংগ্রেসের সরকারী রিপোর্টে বলা হইয়াছে :—

"The leading characteristic of the Congress of 1886 was that it was the whole country's Congress. The Congress of 1885 had been got together with difficulty

---

সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন গান্ধীজীর অনুমোদনে কিন্তু ১৯৩৯ সালে তিনি নির্ব্বাচিত হন সম্পূর্ণ স্বীয় ব্যক্তিগত প্রভাবে, গান্ধীজীর মনোনীত ডাঃ পট্টভী সীতারামিয়াকে পরাস্ত করিয়া। গান্ধীজীর কংগ্রেসে আবির্ভাবের পর তাঁহার অভিমতের বিরুদ্ধে প্রাধান্য স্থাপন মাত্র দুইবার ঘটিয়াছে—প্রথমবার দেশবন্ধু দাশের স্বরাজ্যদল সংস্থাপন এবং দ্বিতীয়বার ত্রিপুরীতে সুভাষচন্দ্রের নির্ব্বাচন। দুইবার সভাপতি হওয়া কোনো বিচিত্র ঘটনা নহে। জওহরলাল তিনবার সভাপতি হইয়াছেন এবং এক ১৯৩৬ সালের মধ্যেই কংগ্রেসের দুই অধিবেশনে (লক্ষ্ণৌ-এপ্রিল এবং ফৈজপুর-ডিসেম্বর) তাঁহাকে সভাপতি করা হয়। তত্রাচ সুভাষবাবুর দ্বিতীয়বার নির্ব্বাচনে বিক্ষুব্ধ গান্ধীজীর বিবৃতি, ত্রিপুরী কংগ্রেসে তাঁহার অনুপস্থিতি এবং কংগ্রেসের অধিবেশনের সময়ে গুজরাটের ক্ষুদ্র দেশীয় রাজ্য রাজকোটে গিয়া অত্যন্ত সামান্য উপলক্ষ্যে অনশন—একদিকে এই ঘটনা, অপর দিকে গান্ধীজীর অনুগামিগণ কর্ত্তৃক কংগ্রেসের নিয়মতন্ত্র অগ্রাহ্য করিয়া ওয়ার্কিং কমিটী মনোনয়নে সভাপতির অধিকারে হস্তক্ষেপ এবং গান্ধীজীর বিনা অনুমোদনে ওয়ার্কিং কমিটী গঠনে নিষেধ, অথচ—সুভাষবাবুর পুনঃপুনঃ আবেদন সত্বেও ওয়ার্কিং কমিটী গঠনে সহযোগিতা করিতে গান্ধীজীর অস্বীকৃতি এবং শেষ পর্য্যন্ত বাধ্য হইয়া সুভাষ বাবুর সভাপতিপদ ত্যাগ—এই পরবর্ত্তী ইতিহাস প্রবন্ধোল্লিখিত মন্তব্যকে সম্পূর্ণ সমর্থন করিতেছে। ১৯৩৫-৩৬ সালের পর দশ বৎসর প্রায় শেষ হইয়া গেল। এখনকার অবস্থা দেখিয়া মনে হয় আগামী আরও দশ বৎসর বা ততোধিক কালের মধ্যে বাঙ্গলাদেশের কেহ কংগ্রেসে প্রাধান্য পাইবে না।

by the exertions of a few leading reformers and included less than one hundred of the more advanced thinkers belonging to the most prominent centres of political activity. The Congress of 1886 may be said to have grown almost spontaneously out of the unanimous resolve of the educated and semi-educated classes throughout the Empire to take a decisive step towards the attainment of that political enfranchisement to which, they have come of late years, to attach so much importance."

অর্থাৎ—

"১৮৮৬ সালের কংগ্রেসের বিশেষত্ব এই যে উহা সমগ্র দেশের কংগ্রেস। ১৮৮৫ সালের কংগ্রেস কোনোরূপে কয়েকটী প্রধান কেন্দ্রের কয়েকজন বিশিষ্ট চিন্তাশীল ও সংস্কারপন্থী মিলিয়া কষ্টেসৃষ্টে করিয়াছিলেন। কিন্তু ১৮৮৬ সালের কংগ্রেস যেন শিক্ষিত জনসাধারণের রাজনৈতিক অধিকার লাভের আকাঙ্ক্ষা হইতে স্বতঃই উৎসারিত হইয়া উঠিয়াছিল।"

১৮৮৬ সালের কংগ্রেসের যে প্রকৃতি—বাঙ্গলায় সবগুলি কংগ্রেস অধিবেশনের প্রকৃতি ইহাই। সমস্ত সবিশেষ আলোচনা করিবার স্থান এক্ষেত্রে নাই।

কংগ্রেসের প্রতি বাঙ্গালীর কি পরিমাণ দরদ ছিল তাহা বুঝাইবার জন্য কয়েকটী ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ করিব। আনন্দমোহন বসুকে যখন ১৮৯৮ সালে মাদ্রাজ কংগ্রেসের সভাপতিত্বে আহ্বান করা হয় তখন তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। নষ্টস্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য তিনি বৎসরের প্রথমভাগে বিলাতে গিয়াছিলেন, সেপ্টেম্বর মাসে ফিরিয়া আসেন এবং টাউন হলে তাঁহাকে দেশবাসীর পক্ষ হইতে একটী অভিনন্দন দেওয়া হয়। কিন্তু তখনও তাঁহার শরীর এত দুর্ব্বল যে, অভিনন্দনের উত্তর দিতে উঠিয়া

কয়েকটী কথা বলিতে না বলিতেই তিনি পড়িয়া যান, অভিনন্দনের সভা দুঃখসভায় পরিণত হয়। শরীর ও স্বাস্থ্যের এই অবস্থায় কংগ্রেসের ডাক আসিল, বন্ধুরা বাদী হইলেন—চিকিৎসকেরা নিষেধ করিলেন। কিন্তু দেশসেবায় উৎসর্গীকৃতপ্রাণ আনন্দমোহন তাহাতে নিবস্ত হইলেন না; সেই অবস্থাতেই কংগ্রেস-সভাপতিত্বের গুরুভার স্বীকার করিয়া লইলেন। ইহার পূর্ব্বে ১৮৯৬ সালে কলিকাতায় যখন কংগ্রেসের অধিবেশন হয়, তাহার পূর্ব্বে স্বনামধন্য ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষের অকালমৃত্যু ঘটে। ভ্রাতৃশোকে কাতর লালমোহন ঘোষ কর্ম্মক্ষেত্র ছাড়িয়া নির্জ্জনতার আশ্রয় লইয়াছেন। তথাপি কংগ্রেসের আহ্বানে সাড়া না দিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি কংগ্রেসের শেষ দিনে উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং স্বীয় ভ্রাতৃবিয়োগের কথা উল্লেখ করিয়া এক মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতায় আপনি কাঁদিয়াছিলেন, সমবেত সকলকেও কাঁদাইয়াছিলেন। ১৯০৬ সালে কলিকাতায় যখন কংগ্রেস বসে তখন রেভারেণ্ড কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় রোগশয্যায়, ডাক্তারেরা সকল রকম চলাফেরা নিষেধ করিয়াছেন, কিন্তু সেই অবস্থায় সমস্ত বিধিনিষেধ অগ্রাহ্য করিয়াই তিনি কংগ্রেসে উপস্থিত হন এবং অধিবেশনের মধ্যে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। এই মূর্চ্ছাই তাঁহার মৃত্যুকে আগাইয়া দিল এবং কয়েকদিন পরেই তাঁহার দেহান্ত ঘটে। ১৯১১ সালে পুনরায় কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। অধিবেশনের নির্দ্দিষ্ট তারিখের দুইদিন পূর্ব্বে অর্থাৎ ২৩শে ডিসেম্বর সুরেন্দ্রনাথের পত্নীবিয়োগ ঘটে কিন্তু সেই শোকযাতনা নিঃশব্দে বহন করিয়া তিনি ২৬শে তারিখ হইতেই কংগ্রেসে উপস্থিত থাকেন এবং উহার কার্য্যেও যোগদান করেন।

কংগ্রেসের জন্য বাঙ্গালীর এইরূপ অন্তরের টান ছিল বলিয়াই প্রথম হইতে বাঙ্গালী ইহাতে মনঃপ্রাণ ঢালিয়া দিয়াছিল। কলিকাতার স্থানীয় নেতৃবৃন্দ ইহাতে অগ্রসর হইয়াছিলেন তো বটেই। মফঃস্বলের প্রধানেরাও

কংগ্রেসের সহিত যোগ দিয়াছিলেন। বহরমপুরের বৈকুণ্ঠনাথ সেন, ফরিদপুরের অম্বিকা মজুমদার, ঢাকার আনন্দ রায় ও ত্রৈলোক্য বসু, ময়মনসিংহের অনাথবন্ধু গুহ, চট্টগ্রামের যাত্রামোহন সেন, বরিশালের অশ্বিনীকুমার দত্ত, রাজসাহীর অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, বর্দ্ধমানের নলিনাক্ষ বসু—ইহাদের নাম সদ্য মনে আসিতেছে। ইহা ছাড়া আরও বেশী উল্লেখযোগ্য যে ভূস্বামী-প্রধানেরাও কংগ্রেসে যোগ দিতে এবং দুর্দ্দিনের সময় ইহার পৃষ্ঠপোষকতা করিতে শঙ্কিত বা সঙ্কুচিত হন নাই। ইহাদের মধ্যে কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র, নাটোরের রাজা জগদিন্দ্রনাথ, ময়মনসিংহের মহারাজা সূর্য্যকান্ত, মুক্তাগাছার ব্রজেন্দ্রকিশোর এবং কলিকাতার রাজা সুবোধচন্দ্র বসু মল্লিকের নাম অমর হইয়া থাকিবে।

## কংগ্রেসের আদর্শ ও কর্ম্মপদ্ধতির অগ্রগতিতে বাঙ্গালী

১৮৮৫ সালে কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে Self-Government বা স্বরাজের কোনো উল্লেখ বা ইঙ্গিত নাই। ১৮৯৯ সালে রমেশচন্দ্র দত্তের সভাপতিত্বে লক্ষ্ণৌতে যে অধিবেশন হয় তাহাতেই প্রথমে কংগ্রেসের Creed বা লক্ষ্য স্থির হয়—"ভারতবর্ষের কল্যাণ ( well-being of India )"। স্বরাজ বা স্বায়ত্তশাসন পাইতে হইবে এ আদর্শ তখন কংগ্রেসের সম্মুখে ছিল না। ১৮৯১ সালে পার্লামেণ্ট তৎকালীন কংগ্রেসের প্রার্থিত কাউন্সিলাধিকার সম্পর্কিত আইন পাশ করেন এবং কংগ্রেস-নেতারা কংগ্রেসের অগ্রগতির চেষ্টা ছাড়িয়া কাউন্সিলে আসন পাইবার চেষ্টায় পরস্পর দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হন ( পরে অবশ্য একাধিকবার ইহা ঘটিয়াছে )। ১৮৯১ হইতে ১৯০০ সাল পর্য্যন্ত দশ বৎসরকে জাতীয় আন্দোলনের সুপ্তি ও জড়তার কাল বলা যায়। কিন্তু বিংশ শতাব্দী পড়িতে না পড়িতেই ইহার প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। কার্জ্জনের অপ্রত্যাশিত আঘাতে বাঙ্গলার ঘুম ভাঙ্গিল এবং বাঙ্গালীর জাগরণের প্রেরণায় সারা ভারতবর্ষ জাগিতে

বাধ্য হইল। ইহা বঙ্গভঙ্গের যুগ। বাঙ্গলায় সেই জাগরণের সমুচ্চ তরঙ্গশিখরে তিনমূর্ত্তি —অরবিন্দ—রবীন্দ্রনাথ ও ব্রহ্মবান্ধব; ইঁহাদের নিকট হইতে ভারতবর্ষ তিন ধারায় শিক্ষা পাইয়াছে—জ্ঞানে, ভাবে ও কর্ম্মে।

স্বরাজ বা স্বাধীনতা লাভ করিতে হইবে—এ আদর্শ কংগ্রেসের সম্মুখে আসিল ১৯০৬ সালে সম্পূর্ণভাবে বাঙ্গালীদের চাপে। "বৃটিশ জাষ্টিসে" যে অটল বিশ্বাসের ভিত্তির উপব কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বঙ্গভঙ্গের আঘাত লাগিয়া বাঙ্গালীর সে বিশ্বাস ভাঙ্গিয়া গেল। বাঙ্গলার যুবক ও কর্ম্মীদের মধ্য হইতে পূর্ণ-স্বাধীনতার দাবী উঠিল; সরকারী বক্রচক্ষু যতই অধিকতর রক্তবর্ণ ধারণ করিল পূর্ণ-স্বাধীনতার দাবী ততই তীব্রতর হইতে লাগিল। বাঙ্গলার সেই যৌবন-জল-তরঙ্গের প্লাবনে পাছে কংগ্রেস-তরণী বানচাল হইযা যায় তাহারই জন্য অভিজ্ঞ কর্ণধার দাদাভাই নওরোজীকে বিলাত হইতে কলিকাতায় আসিতে হইল এবং কংগ্রেসের প্রস্তাবে না হইলেও সভাপতির অভিভাষণে বলিতে হইল আমাদের লক্ষ্য "স্বরাজ"। স্বরাজের অর্থ নওরোজী যাহা দিলেন তাহাতে মোটামুটী স্বাধীনতাই অর্থ দাঁড়াইয়া গেল। সিনফিনের আদর্শে একটা স্বাবলম্বী জাতি গড়িয়া তুলিবার জন্য সুবিখ্যাত প্রস্তাব-চতুষ্টয় গৃহীত হইল—স্বায়ত্তশাসন, জাতীয় শিক্ষা, জাতীয় স্বাবলম্বিতা এবং স্বদেশী ও বয়কট। একথা নিশ্চিত বলা যায় যে, সুকৌশলী রাজনীতিক নওরোজী সভাপতি না হইলে পরবর্ত্তিকালে সুরাটে যে ব্যাপার ঘটিয়াছিল ১৯০৬ সালে কলিকাতা কংগ্রেসেই তাহা ঘটিয়া যাইত।

## ১৯০৬ সালের যুগ-পরিবর্ত্তন বাঙ্গলায়

কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হইতে উহার যে কয়টী যুগ-পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে ১৯০৬ সালের এই পরিবর্ত্তনই তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান ও দূরপ্রসারী।

পরবর্ত্তী যুগে কংগ্রেস যে সকল নূতন নূতন কর্ম্মনীতি অবলম্বন করিয়াছে তাহার প্রায় সকলগুলিরই সূচনা হয় এই ১৯০৬ সালে। ১৮৮৫ হইতে ১৯০৪ সাল পর্য্যন্ত কংগ্রেস সৌখীন রাজনীতির আসর। বড়দিনের ছুটীতে সকলে সমবেত হইতেন, গবর্ণমেণ্টের নিকট নানারূপ আবেদন করিয়া প্রস্তাব উত্থাপন করা হইত এবং "all all" (সকলেই রাজী) বলিয়া উহা পাশ হইয়া যাইত। ১৯০৫ সালেই কংগ্রেসে বঙ্গভঙ্গের প্রভাব পড়ে এবং ১৯০৬ সালে তাহা প্রবল হইয়া উঠে। ১৯০৬ সাল হইতে কংগ্রেসের রাজনীতিতে জীবনের সঞ্চার হয়। আবেদন নিবেদনের পালা শেষ হইয়া প্রত্যক্ষ সজ্ঘর্ষের (direct action) দ্বারা স্বীয় অধিকার অর্জ্জন করিবার এবং সজ্ঘর্ষকে সফল করিবার জন্য জনমতের সমর্থন (sanction) সংগ্রহ করিবার চিন্তা ও চেষ্টা এই সময় হইতেই আরম্ভ হয়।

জনসাধারণের আর্থিক দুর্গতি মোচনের চেষ্টা ও অসহযোগ আন্দোলন,—যাহা কংগ্রেসের পরবর্ত্তী যুগে প্রাধান্যলাভ করে বাঙ্গলাদেশে তাহার আরম্ভ এই সময়েই ঘটে। প্রথমটীর সূচনা স্বদেশী আন্দোলনে। দ্বিতীয়টীর সূচনা—হিন্দুদের পক্ষ হইতে পূর্ব্ববঙ্গের কাউন্সিল বর্জ্জন এবং সুরেন্দ্রনাথ, জে চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন চৌধুরী কর্ত্তৃক কলিকাতার কাউন্সিলের সদস্যপদ ত্যাগ। সুরেন্দ্রনাথ এই পর্য্যায়ের বাঙ্গলা কাউন্সিলে আর যান নাই। অধিকন্তু সরকারী অনারারী পদসমূহ ত্যাগ করিতে হইবে, ইহাও স্থির হয় এবং সুরেন্দ্রনাথ অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ ত্যাগ করেন। সরকারী বিদ্যালয় বর্জ্জন, জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন আন্দোলনও তখন প্রবল হইয়া দাঁড়ায়। এইগুলিকেই মহাত্মা গান্ধী পরে সর্ব্ব-ভারতীয় আকারে কংগ্রেসের কর্ম্মপদ্ধতিরূপে উত্থাপন করেন। অসহযোগ আন্দোলনকে বাঙ্গলার নেতারা যে প্রথমে সংশয়ের চক্ষে দেখিয়াছিলেন এবং সহজে আকৃষ্ট হইতে চাহেন নাই তাহার কারণ, এক অহিংস

আইন-অমান্য ছাড়া, উহার কর্ম্মপদ্ধতির প্রায় সবগুলিই বাঙ্গলায় পূর্ব্বেই পরখ করা হইয়া গিয়াছিল।

এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া যদি বলা যায় যে, বাঙ্গলা কংগ্রেসকে আদর্শ ও কর্ম্মপদ্ধতি দিয়াছিল তাহা অন্যায় হইবে কি? প্রকৃতপক্ষে ১৯০৬ সালের কলিকাতা কংগ্রেসে বাঙ্গলার চাপে প্রবীণেরা যতদূর আগাইয়া পড়িয়াছিলেন ততটা যাইতে তাঁহারা মোটেই ইচ্ছুক ছিলেন না। এই অবস্থা হইতে পাশ কাটাইয়া বাহির হইয়া যাইবার জন্যই সুরাটে কংগ্রেসের অধিবেশন এবং তাহার শোচনীয় পরিণতি*।

১৯০৭ সালে সুরাট কংগ্রেসে নরমপন্থী চরমপন্থী সংঘর্ষে দক্ষযজ্ঞ হইল। কংগ্রেসে চরমপন্থী মতের প্রাবল্যের ভয়ে তৎকালীন কর্ত্তৃপক্ষ মডারেটগণ কংগ্রেসের আদর্শে (Creed) ইহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন যে, বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে ভারতবর্ষ থাকিবে—এই স্বীকৃতি না দিয়া কেহ কংগ্রেসের সভ্য হইতে পারিবে না। ইহার ফলে চরমপন্থী দল কংগ্রেস বর্জ্জন করেন এবং ১৯১৬ সালে লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে অম্বিকা মজুমদার মহাশয়ের সভাপতিত্বে পুনরায় মিলিত হন। এই পুনর্মিলন সাধনের কৃতিত্বটা সম্পূর্ণ বাঙ্গালীর প্রাপ্য। চরমপন্থিগণকে কংগ্রেসে ফিরাইয়া আনিবার বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন পরলোকগত ভূপেন্দ্রনাথ বসু। কংগ্রেসের গঠনতন্ত্রের যে সংশোধনের জন্য চরমপন্থীরা দাবী করিয়াছিলেন তাহা ভূপেনবাবুর চেষ্টাতেই সাধিত হইয়াছিল;

* এই সম্পর্কে সুরেন্দ্রনাথ আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন—"বৈধ উপায়ের প্রতি সাধারণের আস্থা নষ্ট হইয়াছিল এবং উৎসাহী তরুণদল নিরাশ হইয়া অবশেষে সন্ত্রাসবাদের বিপদসঙ্কুল আন্দোলনে আকৃষ্ট হইতেছিল। এই উত্তেজনাপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে সুরাটে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। নাগপুর হইতে সুরাটে কংগ্রেসের অধিবেশন স্থানান্তরিত করিতে হয় কারণ উচ্ছৃঙ্খলতার এরূপ নিদর্শন দেখা যায় যে বোম্বায়ের নেতাগণ নাগপুরে অধিবেশন করা যুক্তিযুক্ত মনে করেন নাই (মহাজাতিগঠনপথে—সুরেন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতির বঙ্গানুবাদ পৃঃ ২০১)।

ভূপেনবাবু জানিতেন এবং বলিয়াও ছিলেন যে, এইভাবে চরমপন্থীদিগকে আনিলে কংগ্রেসে মডারেট-অধিকারের অবসান হইবে। তৎসত্ত্বেও তিনি কংগ্রেসের হিতসাধনের জন্য চরমপন্থীদের প্রার্থিত সংশোধনের ব্যবস্থা করিয়া একতাবদ্ধ ও শক্তিশালী কংগ্রেস গঠনে সাহায্য করিলেন। ফিরোজ শা মেটা মহাশয়ের চোখে ধূলা দিয়াই ভূপেনবাবুকে ইহা করিতে হইয়াছিল—মেটা মহাশয় পূর্ব্বে ঠিক ধরিতে পারিলে কখনও ইহা ঘটিতে দিতেন না। অবশ্য ভূপেনবাবুর অনুমান ও আশঙ্কা সত্যে পরিণত হইতে এক বৎসরের অধিক লাগে নাই। ১৯১৭ সালে কলিকাতা কংগ্রেসেই চরমপন্থী দল আধিপত্য লাভ করে এবং কংগ্রেসে মডারেট-প্রাধান্য নির্ম্মূল হয়। ১৯০৬ সালে কলিকাতায় চরমপন্থীদের অভ্যুদয় এবং ১৯১৭ সালে কলিকাতাতেই কংগ্রেসে তাহাদের স্থায়ী প্রতিষ্ঠালাভ। উভয়ই বাঙ্গলা-দেশে। ইহা নিরর্থক নহে।

## ১৯২০ সালের যুগ-পরিবর্ত্তন বাঙ্গলায়

কংগ্রেসের দ্বিতীয় যুগ-পরিবর্ত্তন ১৯২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতায় বিশেষ অধিবেশনে। এই অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং কোর্ট, কাউন্সিল, কলেজ-স্কুল ও উপাধি—এই চতুর্বিধ বয়কটের* মধ্য দিয়া অসহযোগ-নীতি প্রয়োগ করিতে বলা হয়। ১৫ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গলায় যাহা প্রাদেশিক আন্দোলনের আকারে পরিচালনা করা হইয়াছিল এবং যাহাকে তৎকালীন কংগ্রেস-কর্ত্তৃপক্ষ সহজে অনুমোদন করিতে চাহেন নাই তাহাই এইবার কংগ্রেসের প্রোগ্রাম হইয়া সর্ব্বভারতীয় আকারে উপস্থিত হইল—একথা বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হইবে না। অসহযোগ এবং ইহার পরবর্ত্তী আইন অমান্য আন্দোলনে কংগ্রেসের সম্মান রক্ষার জন্য বাঙ্গলার ত্যাগের পরিমাণ

* বস্ত্র বয়কট পরে ইহার সহিত যুক্ত করা হয়।

ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তৎকালে প্রকাশ্যে স্বীকার করিয়াছিলেন যে ৫০,০০০ ছাত্র অসহযোগ আন্দোলনে বিদ্যালয় ছাড়িয়াছে। ইহা হয়তো বাঙ্গালীর বৈষয়িকবুদ্ধির অভাব সূচনা করে কিন্তু কংগ্রেসের আদর্শের প্রতি কি বিপুল নিষ্ঠার পরিচায়ক! ইহার সহিত অন্যান্য প্রদেশের তুলনাই হয় না। কোথাও ছাত্রসমাজ এইভাবে আত্মবলিদান করে নাই। কেবল ছাত্রসমাজ নহে, আন্দোলনে যোগ দিয়া বিভিন্ন প্রদেশে যাঁহারা কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যেও সর্ব্বাধিক সংখ্যা বাঙ্গলাতেই ঘটিয়াছিল। কংগ্রেসের প্রত্যেকটী আন্দোলনের ইতিহাস অনুসন্ধান করিলেই দেখা যাইবে বাঙ্গলা ত্যাগস্বীকারের শীর্ষস্থানে। ১৯৩০ সালের আইন অমান্য আন্দোলনে উক্ত বৎসরে ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত দণ্ডিতের যে হিসাব ১৯৩১ সালের ২৬শে জানুয়ারী কেন্দ্রীয় আইন সভায় গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে দেওয়া হইয়াছিল তাহাতেও দেখা যায় মোট ৫৪০৪৯ দণ্ডিতের মধ্যে বাঙলার সংখ্যাই সর্ব্বাধিক, ১১৪৬৩।

বাঙ্গালী কংগ্রেসকে শুধু আদর্শ দিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, পরন্তু সে আদর্শকে যে তাহারা ধারণ করিয়া রাখিয়াছে অসহযোগের নীতি প্রবর্ত্তন করিবার সময় তাহা প্রমাণিত হইল। মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ প্রস্তাব প্রথমে যে আকারে রচিত হইয়াছিল তাহাতে পাঞ্জাবের অত্যাচার ও বৃটিশ সরকার কর্ত্তৃক তুরস্কের প্রতি অন্যায়ের প্রতিকারের জন্যই অসহযোগ অবলম্বন করিতে বলা হয়। স্বরাজের কথা তাঁহার প্রস্তাবে ছিল না এবং তিনি উহা লইতেও চাহেন নাই। কলিকাতায় যখন বিষয়-নির্ব্বাচনী সমিতির অধিবেশন হইতেছিল সেই সময় দেশবন্ধু দাশ ও ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি নেতৃবৃন্দের চাপে তিনি বাধ্য হইয়া উহা গ্রহণ করেন। কংগ্রেসের আদর্শের (Creed) মধ্যে স্বরাজ কথাটী এই সময় হইতেই

গৃহীত হয়। এই "স্বরাজ" শব্দটীকে "পূর্ণ স্বাধীনতায" রূপান্তরিত করিবার জন্য সুভাষচন্দ্রের প্রয়াস বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৯২৯ সালের কংগ্রেসে যে ইহা গৃহীত হয তাহাব মূলে সুভাষচন্দ্রেব প্রভাব অনেকখানি।

এই স্বরাজ শব্দের অর্থ লইযা, ইহাতে পূর্ণ-স্বাধীনতা বুঝাইতে পারে কিনা এবং পূর্ণ-স্বাধীনতা আমাদের লক্ষ্য হইতে পাবে কিনা তাহা লইয়া বাদবিতর্ক হইয়াছে বহু। পূর্ণ-স্বাধীনতা যে কংগ্রেসের লক্ষ্য তাহা ১৯২৯ সালেব কংগ্রেসে স্থিরীকৃত হয়। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিযাছি পূর্ণ-স্বাধীনতার দাবী ১৯০৫ সাল হইতেই বাঙ্গলাদেশে উত্থিত হইযাছে। ভূপেন্দ্রনাথ বসুব মত মডারেট এই সম্পর্কে ১৯১৪ সালে মাদ্রাজ কংগ্রেসের সভাপতিরূপে যাহা বলিয়াছেন তাহা উল্লেখযোগ্য। চিরকালের দাসত্ব (Perpetual Tutelege) এবং সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ও বৃটিশ সম্পর্কচ্ছেদ (Absolute Independence and separation from England) ইহার মধ্যে বাছিয়া লইতে হইলে কোনটী লওযার যোগ্য, সে বিষযে তিনি বলিতেছেন—

"Let us leave law alone and deal with the question as one of practical politics. I would not hesitate—whatever might be the terrors of law—from boldly accepting the ideal if I felt convinced that it was possible of attainment."

"আইনের অনুমোদনের কথা না ভাবিয়া পূর্ণ-স্বাধীনতার কথাটা ব্যবহারিক উপযোগিতার দিক হইতে ভাবাই উচিত। আইনের সমস্ত ভীতি অগ্রাহ্য করিযা আমি পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী সাহসের সহিত গ্রহণ করিতে ইতস্ততঃ করিতাম না, যদি স্থির বুঝিতে পারিতাম আমাদের পক্ষে উহা আয়ত্ত করিবার সম্ভাবনা আছে।"

## কর্ম্মনীতিতে তৃতীয় পরিবর্ত্তন

কংগ্রেসের তৃতীয় পরিবর্ত্তন ১৯২২ সালে দেশবন্ধু দাশের প্রবর্ত্তিত কাউন্সিল প্রবেশনীতি। গান্ধীবাদের বিরাট প্রভাবকে অতিক্রম করিয়া দেশবন্ধু দাশ যে ভাবে এই নীতি কংগ্রেসে চালাইযাছিলেন এবং সমগ্র ভারতবর্ষে স্বীয় মত প্রতিষ্ঠিত কবিযাছিলেন তাহাতে বাঙ্গালী চরিত্রের প্রচণ্ড দৃঢ়তা প্রমাণিত হয়। কংগ্রেসের প্রথম পর্ব্বে বাঙ্গলা দেশ যেমন স্বরেন্দ্রনাথের প্রচণ্ড শক্তিময় ব্যক্তিত্ব কংগ্রেসের সেবায় সমর্পণ করিয়াছিল, অসহযোগের পর্ব্বেও তেমনি দিয়াছিল দেশবন্ধু দাশকে। এমন অসাধারণ শক্তিশালী ও দৃঢ়চেতা পুরুষ বিশ্বজগতের রাজনীতিতে বেশী আসেন নাই। ইহার উপর ছিল তাঁহার বিরাট আত্মত্যাগ। যে প্রদেশ দেশবন্ধু দাশের মত ব্যক্তিকে কংগ্রেসের সেবায় উৎসর্গ করিতে পারিযাছে সে প্রদেশের নিকট কংগ্রেসের ঋণ শোধ হইবার নহে।

দেশবন্ধু দাশ যখন কাউন্সিল-নীতি কংগ্রেসে প্রবর্ত্তন করেন তখন মহাত্মা গান্ধী হইতে আরম্ভ করিয়া সাঙ্গোপাঙ্গগণের মধ্যে বেশীর ভাগই ছিলেন তাঁহার একান্ত প্রতিকূল। ১৯২২ সালের ডিসেম্বরে গয়া কংগ্রেসের সভাপতিরূপে কাউন্সিল প্রবেশের কর্ম্মপদ্ধতি তিনি কংগ্রেসে উত্থাপন করেন এবং শ্রীযুক্ত রাজাগোপালের পরিচালনায় গান্ধীজীর নৈষ্ঠিক অনুগামীরা ভোটাধিক্যে তাহা অগ্রাহ্য করিলে তিনি পদত্যাগ করেন। কিন্তু তাঁহার ব্যক্তিত্বের প্রভাবে স্বল্পকালমধ্যেই তিনি স্বীয় অভিমত প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হন এবং ১৯২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসেই দিল্লীতে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন আহ্বান কবিয়া কাউন্সিল প্রবেশের বাধা অপসারিত হয়। ইহার পর কংগ্রেসের দুইটী অধিবেশনে ক্রমে ক্রমে কাউন্সিল প্রবেশ অনুমোদিত ও কংগ্রেসের কর্ম্মপদ্ধতিরূপে গৃহীত হয়। কিন্তু কংগ্রেস কর্ত্তৃক

অনুমোদিত হইতে দিলেও গান্ধীজী নিজে ইহাতে সায় দেন নাই[১]। তিনি ইহাকে স্বীয় পরাজয় বলিয়াই গ্রহণ করেন এবং ১৯২৪ সালের ডিসেম্বরে বেলগাঁও কংগ্রেসের সভাপতিরূপে সমগ্র অসহযোগ কর্ম্মপদ্ধতি প্রত্যাহার করিয়া লইয়া কংগ্রেস হইতে সরিয়া যান। পণ্ডিত মতিলালের অনুরোধে ১৯২৮ সালের কংগ্রেসে তিনি যোগ দিলেন, ১৯২৯ সালেই কাউন্সিল বর্জ্জননীতি পুনরায় প্রবর্ত্তিত হইল। বস্তুতঃ দেশবন্ধুর কর্ম্মপদ্ধতির উপযোগিতা উপলব্ধি করিতে আরও কিছুকাল সময় লাগিয়াছে। দেশবন্ধুর মৃত্যুর প্রায় দশ বৎসর পরে দেখা গেল গান্ধীজী ও তাঁহার অনুগামিগণ পরিপূর্ণ ভাবেই দেশবন্ধুর মতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। মহাত্মা গান্ধী পর্য্যন্ত বলিতেছেন কাউন্সিলনীতি এখন কংগ্রেসে স্থায়িভাবেই থাকিবে, এমন কি আইন অমান্য আন্দোলন প্রবর্ত্তিত হইলেও কাউন্সিলের সদস্যদিগকে আর পদত্যাগ করিতে আহ্বান করা হইবে না। তিনি নিজে কাউন্সিল-প্রার্থীদিগকে উৎসাহদান ও আশীর্ব্বাদ করিতেছেন এবং তাহাদের জয়ে বিপুল আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন[২]। ইহা দেখিয়া মনে হয় গোখেলের সুবিখ্যাত উক্তির সার্থকতা এখনও অক্ষুণ্ণ আছে—"What Bengal thinks to-day, India thinks to-morrow.—বাঙ্গলা আজ যাহা ভাবে ভারতবর্ষ কাল তাহা ভাবিতে আরম্ভ করিবে।"

কংগ্রেসের উদ্ভব, প্রতিষ্ঠা ও অগ্রগতির মূলে বাঙ্গালী-প্রভাব কতখানি তাহা ঐতিহাসিকভাবে বিচার করিয়া দেখা হইল। ঐতিহাসিক আলোচনা এইখানেই ক্ষান্ত করিব। বাঙ্গালার নিকট কংগ্রেসের এই ঋণ পূর্ব্ব নেতৃবৃন্দ কি চক্ষে দেখিতেন তাহারই কিঞ্চিৎ পর্য্যালোচনা করিব।

---

১ ১৯২২ সালের ১৩ই মার্চ্চ গ্রেপ্তার হইয়া ১৯২৪ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী মহাত্মাজী মুক্তি পান।

২ ১৯৩৪ সালে কেন্দ্রীয় এসেম্ব্লীর নির্ব্বাচনে।

## পূর্ব্ব নেতৃগণ কর্ত্তৃক ঋণ স্বীকার

কংগ্রেস সংগঠনে ও কংগ্রেস আন্দোলনের অগ্রগতির জন্য বাঙ্গলা আপনার হৃদয়ের শোণিত মোক্ষণ করিয়া যে পথ রচনা করিয়া দিয়াছে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব নেতৃ-প্রধানগণ বাঙ্গলার এই ঋণ অকুণ্ঠিত কণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন এবং জগতের সমক্ষে প্রচার করিয়াছেন। কংগ্রেসের মধ্যে অধুনা বাঙ্গলার সম্বন্ধে ঔদার্য্যের অভাব ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইতেছে তাহার কারণ অনুসন্ধান করিলে মনে হয় জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রাদেশিকতার চাপে যে বাঙ্গালী-বিদ্বেষ জাগিয়া উঠিতেছে তাহারই ছায়া কংগ্রেসের উপরেও আসিয়া পড়িয়াছে। বাঙ্গলার নিকট ঋণ সর্ব্বদা চক্ষের উপর থাকিলে যে বাধ্যবাধকতা স্বীকার করিতে হয় তাহাতে অন্যান্য প্রদেশের আত্ম-প্রতিষ্ঠার সুবিধা হয় না ইহাও একটা কারণ হইতে পারে। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থা ও ইহার কারণ যাহাই হউক, পূর্ব্বনেতৃবৃন্দের উক্তিতে ও আচরণে বাঙ্গলার নিকট ঋণ স্বীকারে এই কুণ্ঠা দেখিতে পাই না।

বাঙ্গলার নিকট দেশের ও কংগ্রেসের এই ঋণ কত গভীর তাহা ১৯০৯ সালে লাহোর কংগ্রেসের সভাপতি পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়ের বক্তৃতা হইতে পাওয়া যায়। লালমোহন ঘোষের মৃত্যুর উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন :—

"কংগ্রেসের জন্মের বহুকাল পূর্ব্বেই লালমোহন স্বদেশবাসীর অধিকার লাভের জন্য বিলাতে জনমত জাগ্রত করিয়াছিলেন।"

এই ঋণ স্বীকার করিয়াই ১৮৮৫ সালে দাদাভাই নওরোজী লিখিয়াছিলেন :—

"Even five years before the country was wont to set its eyes on Calcutta and take inspiration more or less from her. The luminous intellect and the spirit of eloquence which the Babu carries about him, wherever

he goes, as if it were his natural birthright, gave him a vantage ground over the rest of India."

"পাঁচ বৎসর পূর্ব্বেও সমগ্র দেশ প্রেরণা লাভের জন্য কলিকাতার দিকে চাহিয়া থাকিত। যে নির্ম্মল ধীশক্তি ও বাগ্মিতা বাঙ্গালী বাবুদের সহজাত-শক্তির ন্যায় আযত্ত তাহাই তাহাদের ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের অধিবাসী অপেক্ষা অধিকতর প্রাধান্য দিয়াছে।"

বাঙ্গলার এই প্রাধান্যের প্রভাবেই বাঙ্গালীর অন্তর্নিহিত স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে সংক্রমিত হইতেছিল। ইহা লর্ড কার্জ্জন উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এই প্রাধান্য ধ্বংস করিবার জন্যই তাঁহার বঙ্গ-ভঙ্গের প্রবর্ত্তন। বঙ্গ-ভঙ্গের পক্ষে তৎকালীন ভারত সরকার যে যুক্তি দিয়াছিলেন তাহাতেও বাঙ্গালীর এই প্রাধান্যই স্বীকৃত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট বলিতেছেন :—

"It cannot be for the lasting good of any country or any people that public opinion or what passes for it should be manufactured by a comparatively small number of people at a single centre and should be disseminated thence for universal adoption, all other views being discouraged or suppressed."

অর্থাৎ—"ইহা কখনও কোন দেশ অথবা জাতির পক্ষে স্থায়ী মঙ্গলের নিদান হইতে পারে না যে, জনমত (অথবা জনমতের নামে যাহা চলে) একটি বিশেষ স্থানে অল্প কয়েকটী লোকের দ্বারা সংগঠিত হইয়া তথা হইতে সর্ব্বত্র গ্রহণের জন্য প্রচার করা হইবে এবং অন্য সকল মত প্রচারে বাধা দেওয়া হইবে অথবা একদম চাপিয়া দেওয়া হইবে।"

অন্য কথায়, লর্ড কার্জ্জন প্রচারকার্য্যের দ্বারা বাঙ্গালীর ধীশক্তি ও বাগ্মিতার সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। সুতরাং তাঁহার

প্রযোজন হইয়াছিল বাঙ্গলাব শিক্ষিত সমাজের প্রভাব খর্ব্ব করিয়া সর্ব্ব-ভাবতীয় নেতৃত্বের স্থান হইতে হঠাইয়া দেওয়া এবং কলিকাতার সহিত সমগ্র বাঙ্গলাব যোগ বিচ্ছিন্ন করিয়া, বাঙ্গলা দেশেব মধ্যেই কলিকাতাব বিরোধী মত সৃষ্টি করিয়া উহাব প্রাধান্য নষ্ট করা। মহামতি গোখেল ইহা উপলব্ধি করিয়া বলিযাছেন—"শাসনকার্য্যেব সুবিধাব জন্য বাঙ্গলাকে দ্বিখণ্ডিত কবা হইযাছে উহা মিথ্যা," আসল কথা এই—

"...Their fair Province has been dismembered to destroy their growing solidarity, check their national aspirations and weaken their power of co-operating for national ends, lessen the influence of their educated classes with their countrymen and destroy the political importance of Calcutta."

অর্থাৎ—"বাঙ্গালীদের মধ্যে যে সংহতির শক্তি বাড়িয়া উঠিতেছে তাহা ভাঙ্গিয়া দিবাব জন্য, তাহাদের জাতীয অগ্রগতিব আকাঙ্ক্ষা রোধ করিবাব জন্য, জাতীয় উদ্দেশ্য সাধনে তাহাদের সহযোগিতাব শক্তি দুর্ব্বল করিবাব জন্য, সমগ্র দেশেব উপর বাঙ্গলাব শিক্ষিত সমাজেব প্রভাব প্রতিপত্তি হ্রাস করিবাব জন্য এবং রাজনীতিব ক্ষেত্রে কলিকাতাব প্রাধান্যেব মূলোচ্ছেদ করিবাব জন্যই বাঙ্গলাকে দ্বিখণ্ডিত কবা হইয়াছে।" *

যাহা হউক, দাদাভাই বা কার্জ্জনেব সময় পর্য্যন্ত বাঙ্গালীবাবুব প্রখব ধীশক্তি ও বাগ্মিতাই ভাবতবর্ষকে চমৎকৃত করিয়াছিল। কিন্তু বাঙ্গলাব এই বাবু সন্তানেবা যে প্রযোজন হইলে হাসিতে হাসিতে চবম ত্যাগ-

* কংগ্রেসেব গঠনতন্ত্রে কলিকাতাকে বাঙ্গলাদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিবাব প্রস্তাব হইয়াছিল তাহা ইতিপূর্ব্বে ৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হইয়াছে। ১৯৩৪ সালে কংগ্রেস অধিবেশনেব পূর্ব্বে ১৭ই অক্টোবর গান্ধীজী কংগ্রেসের গঠনতন্ত্রেব যে নূতন পরিকল্পনা প্রকাশ করেন তাহাতেই এ প্রস্তাব করা হয়। প্রতিবাদের ফলে উহা পরিত্যক্ত হয়।

স্বীকার বরণ করিয়া লইতে পারে অথবা নির্ব্বিকারভাবে অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার ক্ষমতা রাখে সে প্রমাণ তখনও হয় নাই। সে পরীক্ষা হইল বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের আন্দোলনের বিরাট সংঘর্ষের মধ্যে। ইহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া গোপালকৃষ্ণ গোখেলের মত ধীর-প্রকৃতি ও স্থির-বুদ্ধি বিচারক ১৯০৫ সালে বারাণসী কংগ্রেসের সভাপতির আসনে বসিয়া স্বীকার করিতেছেন—

"The most outstanding fact of the situation is that the public life of this country has received an accession of strength of great importance and for this all India owes a debt of deep gratitude to Bengal.....Any discredit that is allowed to fall on them affects us all. They on their side must not forget that the honour of all India is at present in their keeping."

"দেশের রাজনৈতিক জীবনে বর্ত্তমানে সর্ব্বাপেক্ষা বিরাট ব্যাপার এই যে, উহাতে প্রবল শক্তির আবির্ভাব হইয়াছে এবং এই নবীন শক্তিলাভের জন্য সমগ্র ভারতবর্ষ বাঙ্গলার নিকট সুগভীর কৃতজ্ঞতার ঋণে আবদ্ধ। ...বাঙ্গলার এই চেষ্টায় যদি আমরা কোথাও নিষ্ফলতার আঘাত লাগিতে দিই সে কলঙ্ক আমাদের সকলকে স্পর্শ করিবে। বাঙ্গালীদিগকে আমি স্মরণ রাখিতে বলি যে, সমগ্র ভারতের আত্মসম্মান এখন তাহাদের মুঠার মধ্যে এই কথা মনে রাখিয়া তাহারা যেন কাজ করে।"

ইহা ছাড়াও গোখেলের সুপ্রসিদ্ধ উক্তি "What Bengal thinks to-day India thinks to-morrow—বাঙ্গলা ভারতবর্ষের ভাবের অগ্রদূত"—একথা সকলেই জানেন—বিশেষ বলিবার দরকার নাই।

বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ রহিত হইবার পর ১৯১১ সালে কংগ্রেসের সভাপতিরূপে যুক্ত-প্রদেশের জননায়ক পণ্ডিত বিষণনারায়ণ ধর বলিতেছেন :—

"The greatest wound in the heart of India was the partition of Bengal...for the cause of Bengal is the cause of India and its triumph marks the triumph of the claims of justice against those of prestige. .Bengal has waged a brave struggle against a great army and it has won a great victory."

"বাঙ্গলার ব্যবচ্ছেদ ভারতবর্ষের হৃদয়ে সর্ব্বাপেক্ষা গভীরতম ক্ষতের সৃষ্টি করিয়াছে ·····কারণ বাঙ্গলার যাহা দাবী তাহাই সমগ্র ভারতবর্ষের দাবী এবং এই দাবীর জয়ে অন্যায় জিদের উপর ন্যায়ের জয় সূচিত হইতেছে। ·····বাঙ্গলা প্রবল শক্তির বিরুদ্ধে সাহসের সহিত যুঝিয়াছে এবং তাহার চেষ্টাও তেমনি বিপুল জয়গৌরবে মণ্ডিত হইয়াছে।"

বঙ্গ-ভঙ্গের দ্বারা যে সম্প্রদায়বিশেষের স্বার্থ সাধিত হইয়াছিল, বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ রহিত করার বিরুদ্ধে যে প্রবল সাম্প্রদায়িক প্রতিকূলতা ছিল এবং সকল সম্প্রদায়ের মত লইয়া উহা রহিত করা হয় নাই—একথা তখনকার কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষ জানিতেন। তথাপি ন্যায় ও ধর্ম্মের মর্য্যাদা রাখিবার জন্য তাঁহাদের যাহা করা বা যাহা বলা উচিত তাহাতে তাঁহারা ইতস্ততঃ করেন নাই। তৎকালীন ভারত সরকারের বঙ্গ-ভঙ্গের দ্বারা বাঙ্গলাকে যে আঘাত করা হইয়াছিল বর্ত্তমানকালের বৃটিশ সরকারের সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তের আঘাত তাহা অপেক্ষা কম মারাত্মক নহে। অবস্থা এবং উদ্দেশ্য উভয় ক্ষেত্রেই এক। কিন্তু বর্ত্তমান কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষ পূর্ব্বতন নেতৃবৃন্দের ন্যায় সৎসাহসের সহিত ন্যায়ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলিতেছেন এ-কথা বলা চলে কি ?

ক্ষেত্রান্তর হইতে লওয়া হইলেও ভারতবর্ষের বর্ত্তমান রাজনৈতিক

আন্দোলন সংগঠনে বাঙ্গালীর দান সম্বন্ধে আর একটি স্বীকৃতিও এখানে উদ্ধৃত করিব। স্যার হেনরী কটনের "নিউ ইণ্ডিয়া" নামক পুস্তক ১৮৮৫ সালের মাঝামাঝি প্রকাশিত হয়। উক্ত পুস্তকে তিনি তৎকালীন রাজনীতিতে বাঙ্গালীর প্রভাব সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

"The Bengalee Babus now rule public opinion from Peshwar to Chittagong, and although the natives of North Western India are immeasurably behind those of Bengal in education and in their sense of political independence, they are becoming as amenable as their brethren of the lower provinces, to intellectual control and guidance. A quarter of a century ago there was no trace of this, the idea of any Bengalee influence in the Punjab would have been a conception incredible to Lord Lawrence, to a Montgomery, or a Macleod."

"বাঙ্গালী বাবুরা বর্ত্তমানে পেশোয়ার হইতে চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত জনমত পরিচালনা করিয়া থাকে; যদিও ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের অধিবাসীরা শিক্ষা এবং রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতাবোধে বাঙ্গালী অপেক্ষা পশ্চাৎপদ—তথাপি বাঙ্গালীর ধীশক্তির প্রাধান্য ও নেতৃত্ব স্বীকার করিয়া লইবার প্রবৃত্তি অন্যান্য প্রদেশবাসীর ন্যায় তাহাদের মধ্যেও সমানভাবে প্রকাশ পাইতেছে। ২৫ বৎসর পূর্ব্বে ইহার কোন চিহ্ন ছিল না। লর্ড লরেন্স, অথবা মণ্টগোমারী অথবা ম্যাকলিয়ডের সময় পাঞ্জাবে কোনরূপ বাঙ্গালী প্রভাবের কথা কল্পনাই করা যাইত না।"

বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের যে সকল অভিমত উদ্ধৃত হইল তাহা হইতে, আশা করি, ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, বাঙ্গলার নিকট কংগ্রেসের যে অপরিশোধনীয় ঋণ, তাহার উপর বিস্মৃতির আচ্ছাদন টানিয়া দিবার চেষ্টা

করিলে অন্যায় করা হইবে। বর্ত্তমানে কোথাও কোথাও এইরূপ চেষ্টা হইতেছে আশঙ্কা হয়। পাছে আমরা পর্য্যন্ত মোহগ্রস্ত হইয়া এই চেষ্টায় সায় দিয়া ফেলি, তাই ক্ষণকালের জন্য যবনিকা অপসারিত করিয়া দেখিয়া লইলাম, বাঙ্গলার পূর্ব্বগুরুগণ ভারতবর্ষের রাজনীতির অগ্রগতিসাধনে কি পরিমাণ ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন এবং কি আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। ইতিহাসের দিক হইতেই সমস্ত জিনিষটাকে দেখিয়াছি এবং সমগ্রভাবে ইতিহাসের রূপটা কি সংক্ষেপের মধ্যে তাহাই দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। এইবার কংগ্রেস বলিতে বর্ত্তমানে যে বিরাট প্রতিষ্ঠান ও আন্দোলনকে বুঝায় তাহারই সংশ্লিষ্ট অংশসমূহ স্বতন্ত্রভাবে লইয়া বাঙ্গালী-প্রভাবের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

# অগ্রগতিতে বাঙ্গলা

কংগ্রেস গঠনে ও কংগ্রেসের আদর্শের পরিপূর্ণতা সাধনের জন্য বাঙ্গলার যে দান, তাহা পূর্ব্বে বাঙ্গলার নিকট কংগ্রেসের ঋণ সম্বন্ধীয় অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে। বিবরণ অতিরিক্ত দীর্ঘ হইয়া পড়ায় কংগ্রেস সম্পর্কিত সাধারণ আলোচনা করিয়াই উহা সমাপ্ত করিতে হইয়াছিল—বিশেষভাবে রাজনৈতিক আন্দোলনকে বিশ্লেষণ করিয়া তাহাতে বাঙ্গালীর কৃতিত্বের ইতিহাস অনুসন্ধান করা সম্ভবপর হয় নাই। বর্ত্তমান অধ্যায়ে তাহারই চেষ্টা করিব।

রাজনৈতিক আন্দোলন বর্ত্তমানে যে বিরাট আকার ধারণ করিয়াছে

তাহা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, নিম্নলিখিত আন্দোলন ও শক্তিসমূহের সমবায়ে উহা সংগঠিত হইয়াছে :—

(১) জাতীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও অর্থভাণ্ডার।
(২) জনসভা ও সম্মেলন।
(৩) প্রচারকার্য্য ও বক্তৃতা।
(৪) নারী জাগরণ।
(৫) ছাত্র ও যুব আন্দোলন।
(৬) স্বেচ্ছাসেবক সংগঠন।
(৭) কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলন।
(৮) জাতীয় একতাসাধনের আন্দোলন।
(৯) জাতীয় সংবাদপত্র।
(১০) জাতীয় সাহিত্য, গাথা ও সঙ্গীত।
(১১) জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।
(১২) জাতীয় প্রদর্শনী।
(১৩) ভারতের বাহিরে আন্দোলন ও প্রচার।

এই আন্দোলন ও শক্তিগুলির অধিকাংশেরই উদ্ভব ও জাগরণ কংগ্রেস স্থাপনের পূর্ব্বে এবং ইহাদের সমষ্টিভূত প্রভাবেই কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পক্ষে অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি হইয়াছিল। অনুসন্ধান ও আলোচনার ফলে যদি দেখা যায় যে, ইহার প্রায় সকলগুলিরই প্রথম উদ্বোধন বাঙ্গলাদেশে এবং বাঙ্গালীরাই তাহাতে অগ্রণী, তাহা হইলে বাঙ্গলার দান ও দাবী অধিকতর স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইবে।

## রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও অর্থভাণ্ডার

রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠনে বাঙ্গলা যে অগ্রণী তাহা পূর্ব্ব অধ্যায়েই বলা হইয়াছে। বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন, ইণ্ডিয়ান লীগ, ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন

ও ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল ইউনিয়ন—কংগ্রেসের পূর্ব্বগামী এই সর্ব্বভারতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ গঠনে ও পরিচালনে বাঙ্গলার কৃতিত্বের প্রমাণও দেখানো হইয়াছে। বর্ত্তমান অধ্যায়ে সমসাময়িক কালের আর দুইটি প্রতিষ্ঠানের নাম করিব। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সর্ব্বতোমুখী বুদ্ধি ও দূরদর্শিতা বহুপূর্ব্বেই রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়াছিল। তিনি ও জজ্ দ্বারকানাথ মিত্র মিলিয়া একটী প্রতিষ্ঠান স্থাপনেও উদ্যোগী হইয়াছিলেন এবং উহার নাম দিয়াছিলেন—"বেঙ্গল এসোসিয়েশন।" এই "বেঙ্গল এসোসিয়েশনের" নাম হইতেই সুরেন্দ্রনাথ পরে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের নামকরণ করেন। ইহা ছাড়া মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সভ্য থাকা কালেই অধিকতর সাধারণ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন অনুভব করিয়া "ন্যাশনাল লীগ" নামে একটী প্রতিষ্ঠান স্থাপিত করেন। অবশ্য প্রথমে ইণ্ডিয়ান লীগ ও পরে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন স্থাপিত হওয়ায় বিদ্যাসাগর মহাশয় বা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের পরিকল্পনা অধিকদূর অগ্রসর হয় নাই।

পূর্ব্ব অধ্যায়ের সবিশেষ আলোচনার পর রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের কথা পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নাই। বর্ত্তমান অধ্যায়ে যে কয়টী বিষয়ের বিশেষ আলোচনা করিতে চাহি তাহার মধ্যে প্রথম হইল রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য অর্থভাণ্ডার স্থাপনের পরিকল্পনা। ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনকালে মহাত্মা গান্ধীর প্রচেষ্টায় স্থাপিত কংগ্রেসের ১ কোটী টাকার তিলক স্বরাজ্য ভাণ্ডারের সহিত আমরা পরিচিত হইয়াছিলাম। এত বড় বিরাট ও ব্যাপক প্রয়াস ইতিপূর্ব্বে হয় নাই। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও আন্দোলন পরিচালনার জন্য কেন্দ্রীয় অর্থভাণ্ডার স্থাপনের উপযোগিতা এই সময় হইতেই অধিকতর প্রবলভাবে অনুভূত ও কার্য্যে পরিণত হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার প্রয়োজনীয়তা ও

কার্য্যকারিতা বাঙ্গলাদেশে স্বদেশী আন্দোলনের সময়েই প্রমাণিত হইয়াছিল এবং ইহার প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল বাঙ্গলা দেশেই আরও বহুকাল পূর্ব্বে।

১৮৮৩ সালের ৫ই মে আদালত অবমাননার দায়ে সুরেন্দ্রনাথ কলিকাতা হাইকোর্ট কর্ত্তৃক দুইমাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। রাজনৈতিক আন্দোলন পরিচালনার জন্য জাতীয় অর্থভাণ্ডার স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার প্রতি এই সময়ে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এবং এসোসিয়েশনে এই উদ্দেশ্যে একটী প্রস্তাবও গৃহীত হয়। কিন্তু তাহা ফলপ্রসূ হয় নাই। পরে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের পিতা ভুবনমোহন দাশের সম্পাদিত 'ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়ন" পত্রিকা ২১শে জুন তারিখের সম্পাদকীয় মন্তব্যে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের উক্ত প্রস্তাবের উল্লেখ করিয়া জাতীয় ধনভাণ্ডার স্থাপনের আবশ্যকতার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কিন্তু প্রস্তাবটী বিশেষ করিয়া জনসাধারণের সম্মুখে অবতারণা করেন কৃষ্ণনগরের উকিল তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়। ৪ঠা জুলাই "ইণ্ডিয়ান মিরর" পত্রিকায় (বিপিনচন্দ্রের মতে "বেঙ্গলীতে"—আত্মজীবনী পৃ ৩৩৫।) প্রকাশিত এক পত্রে তারাপদবাবু এই বিষয় উত্থাপন করেন এবং সুরেন্দ্রনাথের কারাদণ্ডের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপে "ন্যাশনাল ফাণ্ড" স্থাপন করিতে সকলকে অনুরোধ করেন। তারাপদ বাবুর এই প্রস্তাব সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং ২ মাস পরে কারামুক্ত হইয়া সুরেন্দ্রনাথ নিজেই এই বিষয়ে উদ্যোগী হন। প্রথমতঃ ১৭ই জুলাই তারিখে কলিকাতায় অনাথনাথ দেবের বাজারে রেভাঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এক বিরাট জনসভায় জাতীয় অর্থভাণ্ডার স্থাপনের পরিকল্পনা অনুমোদিত হয়। কেবল বাঙলা নহে সমগ্র ভারতের বিভিন্ন স্থানে হইতে বহু টেলিগ্রামে ইহা সমর্থিত হয়। সুরেন্দ্রনাথ নিজেই ইহার উদ্দেশ্য ও সংগ্রহের প্রণালী বুঝাইয়া দিয়া অন্ততঃ ৬ লক্ষ টাকা সংগ্রহের পরিকল্পনা করেন। এই বৎসরেই ডিসেম্বর মাসে সুরেন্দ্র-

নাথের আহূত সর্ব্বভারতীয় সম্মেলন "ন্যাশন্যাল কন্‌ফারেন্সের" প্রথম অধিবেশন। এই অধিবেশনে "ন্যাশন্যাল ফাণ্ড" স্থাপনের প্রস্তাব উত্থাপিত ও জাতির পক্ষ হইতে অনুমোদিত হয়। ইহাতে এত উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছিল যে সভাস্থলেই ছয় সহস্র টাকা চাঁদা পাওয়া যায়। বাঙ্গলার প্রথম ন্যাশনাল ফাণ্ডে ২০,০০০৲ বিশহাজার টাকা সংগৃহীত হয় এবং রাজনৈতিক কার্য্যের জন্য উহা ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের নিকট অর্পণ করা হয়। পরে এই ফাণ্ডে প্রভূত টাকা সংগৃহীত হয়। সুরেন্দ্রনাথ আত্মজীবনীতে স্বীকার করিয়াছেন যে পরবর্ত্তী-কালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন চালাইতে এই "ন্যাশনাল ফাণ্ড" তাঁহার প্রধান সহায় ও নির্ভর হইয়াছিল। এখনও এই ফাণ্ডের উদ্বৃত্ত ১৭০০০৲ টাকার একটী স্থায়ী ফাণ্ড ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের নিকট আছে*।

* সুরেন্দ্রনাথের আত্মীয় এবং রাজনীতিতে তাঁহার ঘনিষ্ঠ অনুগামী শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় সম্প্রতি সুরেন্দ্রনাথের আত্মজীবনীর বাঙ্গলা অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন ("মহাজাতি গঠনপথে—রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি")। ইহার ১৭৪ পৃষ্ঠায় সম্পাদকীয় মন্তব্যে তিনি "ন্যাশনাল ফাণ্ডের" সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াছেন। ইহাতে দেখা যায় "ন্যাশনাল ফাণ্ড" একটী নহে, দুইটী—"রাষ্ট্রগুরু ভারত সভা (ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন) প্রতিষ্ঠার পর তাহার পরিচালনার জন্য একটী ন্যাশনাল ফাণ্ড উঠান, তাহা ট্রাষ্টির জিম্মায় আছে।......ভারত সভার National Fundএর উপস্বত্ব দ্বারা রাজনীতিক আন্দোলনাদি ও সভার অন্যান্য কার্য্য পরিচালিত হয়।" দ্বিতীয় ন্যাশনাল ফাণ্ড সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত চৌধুরী বলিতেছেন—"১৬ই অক্টোবর ১৯০৫ সালে পশুপতি বসু মহাশয়ের বাটীতে যে National Fund উঠেছিল সে টাকা কোন রাজনৈতিক আন্দোলনে খরচ করা হয় নাই। অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক মতিলাল ঘোষ মহাশয় প্রমুখ নেতারা স্থির করেন যে এই অর্থ স্বদেশী শিল্পের উন্নতিকল্পে ব্যয় করা হবে।......এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে মতিলাল ঘোষ মহাশয় ঘরে ঘরে যাতে চরকায় সূতা কাটা হয় সে বিষয়ে তিনি বিশেষ উৎসাহী হন।...... মতিবাবুর কল্পনা গান্ধীজী পরে কার্য্যে পরিণত করার সবিশেষ চেষ্টা করেন। ন্যাশনাল ফাণ্ডের টাকা রাজা দিগম্বর মিত্রের পৌত্র কুমার মন্মথনাথ মিত্রের নামে কোষাধ্যক্ষ রূপে

বাঙ্গলার জন্য এই কেন্দ্রীয় অর্থভাণ্ডার স্থাপন করিয়াই সুরেন্দ্রনাথ ক্ষান্ত হন নাই। কংগ্রেস গঠিত হইলে সুরেন্দ্রনাথ কংগ্রেসের জন্য কেন্দ্রীয় অর্থভাণ্ডার সংগ্রহ করিতে দুয়ারে দুয়ারে ঘুরিয়াছেন। ইহাতে তিনি যেরূপ সাড়া পাইতেন, অপর কেহ তেমন সুবিধা করিতে পারিতেন না। তৎকালীন কংগ্রেসে অর্থ সাহায্যের আবেদন করিয়া সুরেন্দ্রনাথের "ব্রাহ্মণের হস্ত প্রসারণ" (stretching the Brahminical hands) এক সুপরিচিত দৃশ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর বঙ্গভঙ্গের দিন বাগবাজারে পশুপতিনাথ বসুর বাড়ীর জনসভায় সুরেন্দ্রনাথের আবেদনে ৭০,০০০ সত্তর হাজার টাকা সংগৃহীত হয়। ১৮৮৯ সালে বোম্বাই কংগ্রেসের অধিবেশনে তিনি অর্থ সাহায্যের জন্য আবেদন করিলে ৬৪,০০০ টাকা প্রতিশ্রুত হয় এবং ২০,০০০৲ টাকা তৎক্ষণাৎ সংগৃহীত হয়। বর্ত্তমান কালে কংগ্রেসের জন্য অর্থসংগ্রহের দক্ষতায় গান্ধীজী যেরূপ প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন সেকালে সুরেন্দ্রনাথের সেইরূপ প্রাধান্য ছিল। সেইজন্য ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশবাসীরাও অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সুরেন্দ্রনাথের সাহায্য লইত।

---

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে জমা থাকে। ...কুমার মন্মথনাথ মিত্রের মৃত্যুর পর রাজা প্রফুল্লনাথ ঠাকুর ঐ ফাণ্ডের কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন এবং ঐ ফাণ্ডের কোম্পানীর কাগজ ও টাকা Imperial Bankএ তাঁহার নামে জমা থাকে। শ্রীযুত সত্যানন্দ বসু মহাশয় বাৎসরিক ইহার হিসাব অডিট করাইয়া মুদ্রিত করিয়া কমিটির নিকট পেশ করিতেন। রাজা প্রফুল্ল ঠাকুরের মৃত্যুর পর ঐ ফাণ্ডের ট্রাষ্টি নিযুক্ত করা হইয়াছে এবং ভারত সভার সম্পাদক অধ্যাপক নিবারণ চন্দ্র রায় মহাশয় ইহার সম্পাদক নিযুক্ত হয়েছেন। নিবারণ বাবু অল্পদিন হল মারা গিয়াছেন। রাষ্ট্রগুরুর এই ফাণ্ড তোলায় সাহায্য ব্যতীত এই ফাণ্ডের সহিত বিশেষ কোন তাঁহার সংস্রব ছিল না। এই National Fund, Societies Registration Act অনুযায়ী National Fund Society নামে রেজিষ্টারী করা আছে।"

## সভা, সম্মেলন ও প্রচার

বক্তৃতা ও প্রচারকার্য্যে বাঙ্গালীর অগ্রগামিত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব লইয়া বিশেষ করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। রামগোপাল ঘোষ (১৮১৫-১৮৬৮) ইংরাজী ভারতের প্রথম বাগ্মী। তৎকালেই তাঁহার প্রসিদ্ধি এতদূর বাড়িয়াছিল যে, ইংরাজেরা তাঁহাকে "ভারতীয় ডিমস্থিনিস" ও ভারতবর্ষের বার্ক" আখ্যা দিয়াছিলেন। তাঁহার অনুগামীদের প্রসিদ্ধি ও ক্ষমতার তো কথাই নাই। রাজনীতিক্ষেত্রে সুরেন্দ্রনাথ, লালমোহন ঘোষ, কালীচরণ ব্যানার্জ্জী, বিপিনচন্দ্র পাল, ক্ষেত্রান্তরে কেশবচন্দ্র সেন, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, বাঙ্গলার বাহিরে রাজনীতিতে শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু—এক পুরুষের মধ্যে এবং প্রায় একই সময়ে এতগুলি বাগ্মীর উদ্ভব বাঙ্গালী প্রতিভার বিচিত্র বিস্ফুরণ। বাঙ্গলার বাগবিভূতির এই অসাধারণ বিকাশ চিরকাল ইতিহাস স্মরণ করিবে। ইঁহাদের মত দুই একজন পাইলেও যে কোন দেশ প্রখ্যাত ও গৌরবান্বিত হইত। তবে সর্ব্বভারতীয় রাজনৈতিক প্রচার কার্য্যের জন্য বক্তৃতাশক্তির প্রয়োগে ও প্রবর্ত্তনে সুরেন্দ্রনাথই অগ্রণী। তাঁহার পূর্ব্বে কেহ এ বিষয়ে উদ্যোগী হন নাই। ১৮৭৭ ও ১৮৭৮ সালে সুরেন্দ্রনাথ যে দুইবার ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করেন তাহাতেই জনসভা সংগঠন এবং জনমত জাগ্রত করিবার প্রণালী সর্ব্বত্র পরিচিত হইয়া উঠে। ভারতবর্ষের একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্য্যন্ত জনমত নিয়ন্ত্রণে শিক্ষিত বাঙ্গালীর প্রভাব সম্বন্ধে স্যার হেনরী কটন "নিউ ইণ্ডিয়া" গ্রন্থে (১৮৮৫) যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। ১৮৮৪ সালে সুরেন্দ্রনাথের তৃতীয় সফর সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন :—

> "বর্ত্তমানে অবস্থা এমনই যে গত বৎসর একজন বাঙ্গালী বক্তা ইংরাজীতে বক্তৃতা করিতে করিতে যখন উত্তরভারত পরিভ্রমণ করেন তাহা কোনো বীরের দিগ্বিজয় অভিযান বলিয়াই 'মনে

হইতেছিল। এখন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম ঢাকা হইতে মূলতান পর্য্যন্ত যুবকসম্প্রদায়ের মনে সমানভাবে প্রেরণা জাগায়।"

প্রোপাগাণ্ডা বা প্রচারকার্য্য ঠিকমত চালাইতে পারিলে কিরূপ প্রত্যক্ষ ফল পাওয়া যায় সুরেন্দ্রনাথের সর্ব্বভারতীয় অভিযানেই তাহার প্রথম দৃষ্টান্ত দেখা গেল। "ইলবার্ট বিল" আন্দোলনের কথাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। দেশের বিচার ব্যবস্থায় দেশীয় ও ইউরোপীয়দের মধ্যে যে তারতম্য করা হইত তাহার বিরুদ্ধে মন্তব্য করিয়া উহা উঠাইয়া দিবার জন্য কলিকাতার প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট বাঙ্গালী সিভিলিয়ান বিহারীলাল গুপ্ত ছোটলাট স্যার এ্যাসলি ইডেনের (১৮৭৭-১৮৮১) মারফৎ ভারত সরকারের নিকট কঠোর প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন। কিরূপভাবে বিচার পরিচালিত হওয়া উচিত—তাহাও তিনি স্বীয় মন্তব্যে প্রকাশ করেন। বিহারীলাল গুপ্তের এই কঠোর মন্তব্যের ফলে ভারতসরকারের আইন সচিব সার কোর্টনি ইলবার্ট বিচারের এই তারতম্য উঠাইয়া দিবার জন্য ১৮৮২ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী আইন সভায় ইলবার্ট বিল উপস্থিত করিলে শ্বেত এবং মিশ্রশ্বেত সাহেবেরা মিলিয়া প্রবল আন্দোলন করে। তাহাতে ইলবার্ট বিল প্রত্যাহৃত হয়। এই আন্দোলনে দেশীয়গণের চোখ খুলিয়া যায় এবং তাহারাও স্বীয় অধিকারের জন্য সংঘবদ্ধভাবে আন্দোলন করিতে দৃঢ়সংকল্প হয়। ভারতীয় রাজনৈতিক আন্দোলনের আলোচনা করিতে গেলে ইলবার্ট বিল আন্দোলন অবশ্য উল্লেখযোগ্য; কারণ, ইহা প্রত্যক্ষ-ভাবে বৃহত্তর আন্দোলনের প্রেরণা যোগাইয়াছিল। ইলবার্ট বিলের প্রবর্ত্তন এবং খুব সম্ভব প্রণয়নের কৃতিত্বও সম্পূর্ণভাবে বিহারীলাল গুপ্তের প্রাপ্য।

সম্মেলন আহ্বানে বাঙ্গলাদেশের উদ্যোগ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রসঙ্গে পূর্ব্ব অধ্যায়েই আলোচিত হইয়াছে। জনসভার উপযোগিতা এবং কার্য্যকারিতা বাঙ্গলা দেশেই প্রথম প্রমাণিত হয়। লর্ড নর্থব্রুকের

আমলে ( ১৮৭২-৭৬ ) স্বনামধন্য শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় টাউন হলে সাধারণ সভায় গবর্ণর জেনারেলের বিরুদ্ধে নিন্দাসূচক প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তৎকালীন নেতৃবৃন্দ ও সভাপতি বহু চেষ্টায় তাঁহাকে নিরস্ত করেন। কিন্তু প্রস্তাবের প্রভাব সম্পূর্ণভাবেই ফলপ্রসূ হইয়াছিল। লর্ড কার্জ্জনের আমলে তিনি ১৯০৫ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশন উপলক্ষে সমগ্র এসিয়াবাসীকে মিথ্যাবাদী, অসাধু ও কপট বলিয়া অভিহিত করেন; তখন তাহার প্রত্যুত্তর দিবার জন্য পরবর্ত্তী ১০ই মার্চ্চ কলিকাতা টাউন হলে ডাঃ রাসবিহারী ঘোষের সভাপতিত্বে বিরাট জনসভায় কার্জ্জনের উক্তির প্রতিবাদ ও নিন্দা করা হয়। দেশীয়দের প্রকাশ্য সভায় রাজপ্রতিনিধির তিরস্কারসূচক প্রস্তাব গ্রহণ ভারতবর্ষের মধ্যে ইহাই প্রথম।

## নারী জাগরণ

ইংরাজী শিক্ষার প্রসার, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আন্দোলন এবং ব্রাহ্মমতের প্রচার—এই তিন চেষ্টার ফলে কংগ্রেসের বহুকাল পূর্ব্বেই বাঙ্গলাদেশে নারীরা জনহিতকর কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছিলেন। কংগ্রেসের দিক হইতে দেখিলে উহাতে নারী প্রতিনিধি গ্রহণ করিবার আন্দোলন বাঙ্গলাদেশ হইতেই আরম্ভ হয়। ভারত সভার অন্যতম উদ্যোক্তা ও কর্ম্মী দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম এ বিষয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ফরিদ-পুরের অন্তর্গত লোনসিং স্কুলে শিক্ষকের কাজ করিবার সময়েই তিনি তথা হইতে "অবলাবান্ধব" পত্রিকা প্রকাশ করিতেন। ১৮৮৯ সালে বোম্বাই সহরে কংগ্রেসের পঞ্চম অধিবেশনে প্রথম যে ছয়জন নারীপ্রতিনিধি যোগ দেন তাঁহাদের মধ্যে স্থানীয় চার জনকে ছাড়িয়া দিলে অপর দুই জন বাঙ্গালী, দ্বারকানাথের পত্নী ডাঃ কাদম্বিনী গাঙ্গুলী, এবং রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা ভগ্নী শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী ( ঘোষাল )। ১৮৯০ সালে কলিকাতায়

পরবর্ত্তী অধিবেশনেও ইঁহারা প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত ছিলেন। ডাঃ বিধুমুখী বসুর নামও কোনো কোনো বিবরণে পাওয়া যায়। কংগ্রেস মঞ্চের পুরোভাগে নারীর অগ্রসর হওয়ার সূচনাও বাঙ্গলা দেশে। ডাঃ কাদম্বিনী গাঙ্গুলীই মহিলা প্রতিনিধি হিসাবে কংগ্রেসে প্রথম বক্তৃতা করেন। কংগ্রেসের আলোচনায় নারী প্রতিনিধিদিগের যোগ দিবার অধিকার যে স্বীকৃত হইয়াছে তাহারই নিদর্শনস্বরূপে পূর্ব্বোক্ত কলিকাতা কংগ্রেসে সভাপতিকে ধন্যবাদ প্রদানের প্রস্তাব করিবার ভার ডাঃ কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়ের উপর ন্যস্ত হয়। অ্যানি বেসান্ট স্বীয় গ্রন্থে ( How India Wrought Her Freedom) এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন —"...the first woman who spoke from the Congress platfrom, a symbol that India's freedom would uplift India's womanhood".

## ছাত্র-যুব-আন্দোলন ও স্বেচ্ছাসেবক সংগঠন

ছাত্র ও যুব আন্দোলনের সূত্রপাতও বাঙ্গলা দেশে কংগ্রেসের বহু পূর্ব্বে। ১৮৭৪ সালের নবেম্বরে সদ্যবিলাতপ্রত্যাগত আনন্দমোহন বসু প্রথম ছাত্রসঙ্ঘ ( Student's Association ) গঠন করেন, আনন্দমোহন হইলেন সভাপতি এবং নন্দকৃষ্ণ বসু নামে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্র হইলেন সম্পাদক। সুরেন্দ্রনাথ সিভিল সার্ভিস হইতে অপসারিত হওয়ার পরে উহাতে যোগ দেন। প্রকৃতপক্ষে সুরেন্দ্রনাথকে চিনিয়া বাহির করিয়াছিল এবং নেতা হিসাবে সাধারণের সম্মুখে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল বাঙ্গলার ছাত্রেরা ; ছাত্র সমাজকে অবলম্বন করিযাই তাঁহার বাগ্মিতার উদ্ভব। সিভিল সার্ভিস হইতে অপসারিত হইয়া সুরেন্দ্রনাথ যখন কলিকাতায় আসেন তখন ভদ্রসমাজে তাঁহার স্থান ছিল না।

তাঁহার তখন দারুণ দুর্দ্দশা। এই দুর্দ্দশার সময় বিদ্যাসাগরের বিশ্ব-প্রসারী করুণার মধ্যে তিনি আশ্রয় পান এবং মেট্রোপলিটান কলেজে ২০০্ টাকা মাহিনায় অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এইখান হইতেই ছাত্র-মহলের সঙ্গে তাঁহার পরিচযের সূত্রপাত—এই পরিচয়ই পরে তাঁহাকে নেতৃত্বে উন্নীত করে। সুরেন্দ্রনাথের প্রথম সাধারণ বক্তৃতার আয়োজন পূর্ব্বোক্ত ছাত্রসঙ্ঘের উদ্যোগেই হইয়াছিল। বক্তৃতার বিষয় ছিল—"শিখ শক্তির অভ্যুত্থান"। বর্ত্তমান হিন্দু স্কুলে ( তৎকালীন হিন্দু কলেজ ) এই বক্তৃতা হয় এবং ইহাতেই তাঁহার বক্তৃতার খ্যাতি ছড়াইয়া পড়ে। এই ছাত্র সভার উদ্যোগেই ইটালীর উদ্ধারকর্ত্তা জোসেফ ম্যাটাসিনী ও দেশোদ্ধারে যুবক ইটালীর উদ্যম সম্বন্ধে সুরেন্দ্রনাথের জ্বালাময়ী বক্তৃতা বিপুল প্রেরণার সৃষ্টি করে।

রাজনৈতিক ঘটনার ধারা অনুসরণ করিলে বলা যায় যে, সুরেন্দ্রনাথ-আনন্দমোহনের এই "ষ্টুডেন্টস্ এসোসিয়েশন" পরবর্ত্তী ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের জনক। সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতায় তৎকালীন ছাত্র ও যুবক সমাজে যে দেশপ্রেম ও জাতীয় ভাবের প্লাবন দেখা দিয়াছিল তাহাকে স্থায়ী করিবার ও তাহা দেশের কল্যাণসাধনে নিযুক্ত করিবার কথা সহজেই নেতৃ-বৃন্দের মনে হইল এবং ইহার জন্য স্থায়ী ও বৃহত্তর সংঘগঠনের প্রয়োজনীয়তা তাঁহারা অনুভব করিলেন। সুরেন্দ্রনাথ, আনন্দমোহন, মনোমোহন প্রভৃতি নেতৃবৃন্দের এই আগ্রহ ও চেষ্টার পরিণতিতেই ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সৃষ্টি। পেশোয়ার হইতে চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত যুবকসমাজের মনের উপর সুরেন্দ্রনাথ কিরূপ আধিপত্য করিতেন তৎসম্বন্ধে স্যার হেনরী কটনের অভিমত পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। বিপিনচন্দ্র পাল এবং সমসাময়িক অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবৃন্দও তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। বস্তুতঃ সুরেন্দ্রনাথ যেমন বৃহত্তর রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রবর্ত্তক তেমনি ছাত্র ও যুবক সমাজের মধ্যে ভাবের ও কর্ম্মের প্রেরণা জাগরিত করা এবং তাহা রাজ-

নৈতিক উদ্দেশ্য সাধনে নিয়োজিত করাতেও অগ্রণী। বাঙ্গলাদেশই এই নবজাগ্রত শক্তির পাদপীঠ।

ছাত্র ও যুব আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে স্বেচ্ছাসেবক সংগঠনের প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে। প্রকৃত পক্ষে উভয়ের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ; কারণ ছাত্র ও যুবক-গণের মধ্য হইতেই স্বেচ্ছাসেবক সংগৃহীত হয় এবং ছাত্র ও যুবক মহলে আধিপত্য যাহার বেশী তাঁহার পক্ষেই স্বেচ্ছাসেবক সংগঠন সহজসাধ্য হয়। স্বেচ্ছাসেবক সংগঠন আরম্ভ হয় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনে কলিকাতায় ১৮৮৬ সালে ( অম্বিকাচরণ মজুমদার "ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল এভোলিউসন" পৃঃ ২০৪ ) এবং এই স্বেচ্ছাসেবক সংগঠনের জন্যই নেতৃবর্গ সুরেন্দ্রনাথের শরণ লইতে বাধ্য হন। প্রথম স্বেচ্ছাসেবকগণের মধ্যে ভূপেন্দ্রনাথ বসু পরে কংগ্রেসের সভাপতি হন। পরবর্ত্তী কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যে যাঁহারা কংগ্রেসের কার্য্যে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে অখিলচন্দ্র দত্ত, মাখনলাল সেন, ৺রাজেন্দ্রচন্দ্র দেব প্রভৃতির নাম করা যাইতেপারে।

## কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলন

গণ-আন্দোলন বা অপেক্ষাকৃত নির্দ্দিষ্ট আকারে কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলন ইদানীং রাজনৈতিক আন্দোলনের একটী বিশেষ অংশ হইয়া উঠিয়াছে। কংগ্রেস ইহা স্বীকার করিয়া লইয়াছে এবং এই আন্দোলনের প্রসার ও পরিপুষ্টির জন্য যথাসম্ভব সহায়তাও করিয়াছে। বাঙ্গলাদেশেই এই দুইটী আন্দোলনের প্রবর্ত্তন—কৃষক আন্দোলনের প্রবর্ত্তন নীলকরদিগের অত্যাচারের প্রতিবাদে এবং শ্রমিক আন্দোলনের প্রবর্ত্তন আসামের চা বাগানে কুলীদিগের দুরবস্থা ও তাহাদিগের প্রতি দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদ কল্পে। নীলকরদিগের অত্যাচার নিবারণের জন্য নীলচাষীদের আন্দোলন এবং দেশের সকল শ্রেণীর সমবেতভাবে সেই আন্দোলন সমর্থন বাঙ্গলার রাজনৈতিক তথা সামাজিক ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ইহাকে

আন্দোলন না বলিয়া প্রজাবিদ্রোহ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কোম্পানী নীলের চাষ প্রবর্ত্তন করেন, ক্রমশঃ নীলকরদিগের হাতে পড়িয়া বাঙ্গলার চাষী প্রজারা ক্রীতদাসের পর্য্যায়ে উপনীত হয়। এই অবস্থা হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য তাহারা অহিংস প্রতিরোধের নীতি ( Passive Resistance ) অবলম্বন করে। ১৮৫০ হইতে আন্দোলনের প্রারম্ভ এবং ১৮৬০ সালে ইহার চূড়ান্ত পরিণতি। ১৮৫৯ সালে নীলচাষীদের ব্যাপক ধর্ম্মঘট এবং শিশিরকুমার ঘোষের পরিচালনায় যশোহর জেলায় বিরাট সংঘবদ্ধ আন্দোলন তৎকালীন অবস্থায় উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বর্ত্তমানেও সেরূপ আন্দোলন সংঘবদ্ধতা ও শক্তির পরিচায়ক বলিয়া গৌরবলাভ করিত। তৎকালীন বাঙ্গলার কৃষক সমাজ এই আন্দোলনে জয়লাভ করিয়া কৃষক আন্দোলনের পথ প্রদর্শন করিয়াছে। এই নীলকর অত্যাচার দমনের জন্যই প্রসিদ্ধ সাংবাদিক হরিশ্চন্দ্রের লেখনীধারণ এবং দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ রচনা।

আসামের চা বাগানে কুলীদের অবস্থা নীলচাষীদের অপেক্ষাও শোচনীয় ও ভয়াবহ হইয়া পড়িয়াছিল। ইহাদের এই দুরবস্থার প্রতিকারের জন্য "কুলি আন্দোলন" প্রবর্ত্তনের কৃতিত্ব ভারতসভার কর্ম্মী দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রাপ্য। ১৮৮৬ সালে তিনি কুলির বেশে চা বাগানের কুলিদের সহিত মিশিয়া উহাদের প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে বহু তথ্য সংগ্রহ করিয়া আনেন। পরে বাঙ্গালায় "সঞ্জীবনী" এবং ইংরাজী "বেঙ্গলীতে" প্রবন্ধ লিখিয়া ইহার প্রতিকারে জনমত জাগ্রত করেন। ১৮৮৭ সালে কংগ্রেসের মাদ্রাজ অধিবেশনে তিনি কংগ্রেসের সমক্ষে ইহা উত্থাপনের চেষ্টা করিলে প্রাদেশিক ব্যাপার বলিয়া উহাতে অনুমতি দেওয়া হয় নাই। ১৮৮৮ সালে কলিকাতায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনীর প্রথম অধিবেশনে আসাম শ্রীহট্টের প্রতিনিধিস্বরূপে বিপিনচন্দ্র পাল কুলিদের দুরবস্থার প্রতিকার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। কংগ্রেস যে ইহা প্রাদেশিক

ব্যাপার বলিয়া আলোচনা করিতে রাজী হন নাই তাহার প্রতিবাদে কৃষ্ণকুমার মিত্রের এক প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং ইহা যে বস্তুতঃ সর্ব্বভারতীয় সমস্যা তাহা প্রতিপাদন করা হয়। বলা বাহুল্য দ্বারকানাথই এই উভয় প্রস্তাবের মূলে। কুলিদের দুরবস্থা-প্রতিকারের দায়িত্ব কংগ্রেসকে স্বীকার করাইয়া লইবার জন্য তাঁহার চেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হইতে ১০ বৎসর লাগিয়াছিল। ১৮৯৬ সালে কলিকাতায় কংগ্রেসের দ্বাদশ অধিবেশনে কংগ্রেস এ সম্বন্ধে প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে, ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের উদ্যোক্তারা প্রথম হইতেই এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন। কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলনের সহায়তার জন্যই ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন স্থাপনের সময় হইতে নিয়ম হইয়াছিল যে উহার চাঁদা সাধারণের পক্ষে ৫৲ কিন্তু শ্রমিক ও কৃষকগণের চাঁদা বার্ষিক ১৲ মাত্র। প্রথম হইতেই ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন বাঙ্গলা-দেশের সর্ব্বস্থানে রায়ত সভা স্থাপনে সচেষ্ট হন এবং বিভিন্ন জেলায় রায়ত সভা গড়িয়া উঠে। কৃষকগণ যাহাতে আত্মরক্ষায় সক্ষম হয় তৎসম্বন্ধে তাহাদের উপদেশদান, সংঘবদ্ধতা-সম্বন্ধে শিক্ষাদান ও অন্যান্য ভাবে সহায়তা করা হয়।

## জাতীয় ঐক্য সাধনা

জাতীয় একতা যে সাফল্যলাভের মূলমন্ত্র একথা বাঙ্গালী, বিশেষ করিয়া বাঙ্গালী হিন্দুরা, যেমন করিয়া উপলব্ধি করিয়াছিল তেমন করিয়া অপরে উপলব্ধি করিতে পারে নাই। বাঙ্গালীর সমন্বয়মুখী অধ্যাত্মদৃষ্টি অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় এই ক্ষেত্রেও তাহাকে সত্য উপলব্ধির ক্ষমতা দিয়াছিল। ১৮৮৬ সালেই কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে পণ্ডিতাগ্রগণ্য রাজেন্দ্রলাল মিত্র বলিতেছেন—

"It has been the dream of my life that the scattered

units of my race may some day coalesce and come together, that instead of living merely as individuals we may some day so combine as to be able to live as a nation. In this meeting I behold the commencement of such coalescence. I hope the union will not be very distant."

"আমার জাতির বিক্ষিপ্ত অংশসমূহ একদিন না একদিন একত্রীভূত হইবে—এই স্বপ্নই আমি চিরজীবন দেখিয়া আসিয়াছি। আশা করিয়াছি যে, বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি ভাবে না থাকিয়া আমরা একদিন মিশিয়া একটা অখণ্ড জাতি গঠন করিব। অদ্যকার এই সভায় তাহার সূচনা দেখিতেছি। আশা করি জাতীয় একতাও বহু দূরে নহে।" ইহার পর তিনি কংগ্রেসে যোগদানের জন্য মুসলমান সমাজের নিকট আবেদন করিয়াছেন।

রাজা রাজেন্দ্রলালের উক্তিতে যে ভাব ও আদর্শের সাধনার পরিচয় রহিয়াছে বাঙ্গলার মনীষা ও চিন্তাধারার ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য—প্রদেশ, ধর্ম্ম ও সম্প্রদায় নিরপেক্ষ হইয়া সকলে সমগ্র ভারতের কথা ভাবিয়াছেন, ঐক্যবদ্ধ ভারতের মহিমা কল্পনা করিয়াছেন এবং তাহাই প্রচার করিয়াছেন। সাহিত্যে, সঙ্গীতে, বক্তৃতায় সর্ব্বত্রই সমগ্র ভারতবর্ষের নামে আবেদন। কংগ্রেসের প্রথম হইতে আজ পর্য্যন্ত জাতীয় সঙ্গীত রচনায় বাঙ্গলাদেশের এই ঐক্যোপলব্ধির সুস্পষ্ট প্রমাণ বর্ত্তমান। রামমোহনের কথা ছাড়িয়া দিয়া রামগোপাল ঘোষ ও হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে বঙ্কিমচন্দ্র, দেশবাৎসল্যের প্রথম নেতা বলিয়াছেন—রামগোপাল বক্তারূপে এবং হরিশ্চন্দ্র সাংবাদিকরূপে। সমগ্র ভারতবর্ষ হিসাবেই তাঁহাদিগকে দেশবাৎসল্যের প্রথম প্রবর্ত্তক বলা যায়। ভারতে এক দেশ ও এক জাতির প্রচার তাঁহাদের জীবনসাধনা। রাজা রাজেন্দ্রলালের

পূর্ব্বোদ্ধৃতি উক্তি ১৮৮৬ সালে। রামগোপাল ও হরিশ্চন্দ্র তাহার বহু পূর্ব্বগামী। কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার দ্বাদশ বৎসরেরও পূর্ব্বে বঙ্কিমচন্দ্র "বঙ্গদর্শনে" "পত্রসূচনায়" বলিযাছিলেন :—"ভাবতবর্ষীয় নানাজাতি একমত, একপরামর্শী, একোদ্যোগী না হইলে ভাবতবর্ষের উন্নতি নাই।" ইণ্ডিয়ান এসোসিযেশন স্থাপিত হয় ১৮৭৬ সালেব ২৬শে জুলাই ; তখনই তাহার উদ্দেশ্যের মধ্যে দেখিতে পাই—একই রাজনীতিক স্বার্থ ও আকাঙ্খার ভিত্তিতে ভারতীয সমাজের বিভিন্ন অংশকে ঐক্যবদ্ধ করা এবং "হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়দ্বয়ে সম্প্রীতিস্থাপন করা"। এই প্রসঙ্গে স্বরেন্দ্রনাথ বলেন—Even then the conception of a united India had taken firm possession of the minds of the Indian leaders in Bengal"—"ঐক্যবদ্ধ ভারতের ধারণা বাঙ্গলায ভারতীয নেতৃবৃন্দেব মনে সেই সমযেই বদ্ধমূল হইয়াছিল।"

জাতীয় একতার জন্য বাঙ্গালীব এই ব্যগ্রতা কংগ্রেসের অভিভাষণ হইতেও স্পষ্ট অনুমান করা যায। সাম্প্রদায়িক সমস্যা ও মাইনরিটীর অধিকার লইয়া কংগ্রেসের একাধিক সভাপতি মাথা ঘামাইয়াছেন। কিন্তু স্বীয প্রদেশে আপনারা মাইনরিটি সম্প্রদায়ভুক্ত হইলেও কোনো বাঙ্গালী হিন্দু সভাপতির অভিভাষণে ইহার উল্লেখমাত্র নাই। বাঙ্গলার হিন্দু মাইনরিটীর রাজনৈতিক অধিকার যাহাতে সুরক্ষিত হয় সে বিষয়ে অন্যান্য প্রদেশের সভাপতিরা ব্যগ্রতা দেখাইয়াছেন ; কিন্তু বাঙ্গালী সভাপতিরা এবিষয়ে একদম নীরব। বাঙ্গালী হিন্দুদের এই অসাম্প্রদায়িকতা এবং একতার আকাঙ্ক্ষার যোগ্য মর্য্যাদা ও প্রত্যুত্তর মিলিয়াছে কিনা এবং ইহার ফল তাহাদের পক্ষে কল্যাণজনক হইযাছে কিনা সে কথা এখানে আলোচ্য নহে।

## জাতীয় সংবাদ পত্র

জাতীয় সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠাও বাঙ্গলা দেশেই প্রথম। সংবাদপত্র যে দেশাত্মবোধের বাহন ইহা বাঙ্গালী সমাজ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদেই উপলব্ধি করিয়াছিল। পরবর্ত্তীকালে রাজনৈতিক আন্দোলনে বাঙ্গলা যে অগ্রগামী হইয়াছে সংবাদপত্র-জগতে প্রাধান্য তাহার অন্যতম কারণ। শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদেই দেখিতে পাই বিভিন্ন দলের ও বিভিন্ন মতবাদীদের উদ্যোগে প্রচারিত সংবাদপত্রে রাজনীতি ও জাতীয়তার আলোচনার বহুল প্রচলন। ইহাদের মধ্যে বাঙ্গলা ভাষার প্রথম দৈনিক সংবাদপত্র (১৮৩১) ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের "সংবাদ প্রভাকর" উল্লেখযোগ্য। দেশাত্মবোধ প্রচারে এবং নব্য রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর শিক্ষাদানে "সংবাদ প্রভাকরের" কৃতিত্ব অশেষ। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগেই সুপ্রসিদ্ধ সাংবাদিক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় নির্ভীক ও স্বাধীন লেখনী পরিচালনায় প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিলেন। তৎকালীন "হিন্দু পেট্রিয়টের" প্রচার কার্য্যেই বাঙ্গলায় নীলকর সাহেবদের অত্যাচার প্রশমিত হইয়াছিল। নীলকর সাহেবেরা হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যুর পর ইহার প্রতিশোধ লইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের চক্রান্তে হরিশ্চন্দ্রের বিধবা পত্নী সর্ব্বস্বান্ত হন। হরিশ্চন্দ্রের পর সম্পাদক-শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণদাস পাল হিন্দু পেট্রিয়টের পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন; তাঁহার ক্ষমতাও সর্ব্বজন প্রসিদ্ধ। ইণ্ডিয়ান মিররের নরেন্দ্রনাথ সেনের নামও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কেবল যে রাজধানীতেই সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল তাহা নহে কংগ্রেস স্থাপনের বহু পূর্ব্বে বাঙ্গলার জেলায় জেলায় সংবাদপত্র স্থাপিত ও প্রচারিত হইয়াছিল। যশোহরের 'অমৃতবাজার পত্রিকা', ঢাকার 'হিন্দু হিতৈষিণী' ময়মনসিংহের 'ভারত মিহির', শ্রীহট্টের 'শ্রীহট্ট প্রকাশ' চুঁচুড়ার 'সাধারণী'র নাম করা যাইতে পারে। ১৮৭৮ সালে যখন 'দেশীয় সংবাদপত্র দমন আইন' পাশ হয় তখন সমগ্র ভারতবর্ষে কিছু কম ৫০০ কাগজ চলিতেছে। ইহার মধ্যে অর্দ্ধাধিক ছিল বাঙ্গলায়।

সংবাদপত্র জগতে এই প্রাধান্য বাঙ্গলাদেশ আজ পর্য্যন্ত অক্ষুন্ন রাখিয়াছে। জাতীয় ভাবধারার বাহনস্বরূপে বাঙ্গলাদেশে যত সংবাদপত্রের উদ্ভব হইয়াছে এবং এখনও যত সংবাদপত্র চলিতেছে এত আর কোনো প্রদেশে নাই।

## জাতীয় সাহিত্য, গাথা ও সঙ্গীত

জাতীয় সাহিত্যের কথা বলিতে গেলে সর্ব্বপ্রথমেই বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার কথা মনে আসিবে। কিন্তু বাঙ্গলাদেশে জাতীয় সাহিত্যের উদ্ভব অনুসন্ধান করিতে হইলে আরও বহুকাল পূর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিতে হইবে। বস্তুতঃ ইহাও প্রায় উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমপাদের নিকটে গিয়া পড়িবে। তৎকালেই বাঙ্গালীপ্রধানদিগের রচনা দেশপ্রেমে ওতঃপ্রোত হইয়া উঠিয়াছে। যে নব জীবনের প্রেরণায় বাঙ্গলাভাষা ও সাহিত্যের পরিপুষ্টি সেই একই প্রেরণায় জাতীয় সাহিত্যের আবির্ভাব। রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রে ইহার পরিণতি ও ঐশ্বর্য্যময় বিকাশ। তাঁহার পরে যাঁহারা এই ধারার অনুবর্ত্তন করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ স্বীয় বিরাট ও অভ্রভেদী মহিমায় দ্বিতীয় যুগপ্রবর্ত্তকরূপে দণ্ডায়মান। প্রারম্ভ হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত জাতীয় সাহিত্য রচনার অব্যাহত ধারায় দুইবার ব্যাপক ও অলোকসাধারণ প্রতিভার বিস্ফুরণ—একবার বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িককালে, দ্বিতীয়বার বঙ্গভঙ্গের আন্দোলনে। ইহার পর রাজনৈতিক আন্দোলনের প্লাবন ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের উপর দিয়াই বহিয়া গিয়াছে। কিন্তু এই সময়ের আন্দোলন বাঙ্গালীর চিত্তলোকে যে অক্ষয় সম্পদের সৃষ্টি করিয়াছে এমনটি আর কোথাও ঘটিল না। জাতীয় সাহিত্য রচনায় অন্য কোনো প্রদেশ এ পর্য্যন্ত বাঙ্গলাদেশের কাছাকাছি আসিতে পারিল না।

পরবর্ত্তী রাজনৈতিক আন্দোলন কোথাও প্রতিভার সৃজনীশক্তিকে জাগাইতে পারিল না।

জাতীয় সাহিত্যে যেমন, জাতীয় গাথা ও জাতীয় সঙ্গীতের রচনায়ও তেমনি বাঙ্গলা অগ্রগামী। বাঙ্গালী যে ভারতবর্ষকে সমগ্রভাবেই দেখিয়াছে কংগ্রেসের উদ্ভবের বহুপূর্ব্বে রচিত গাথা ও সঙ্গীতগুলিই তাহার প্রত্যক্ষ নিদর্শন। ঈশ্বর গুপ্তের কথা ছাড়িয়া দিয়া কবিবর রঙ্গলালের "স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায়" কবিতাটী ১৮৫৮ সালেই "পদ্মিনী উপাখ্যানে" প্রকাশিত হয়। ১৮৬৭ ও ১৮৬৮ সালে হিন্দুমেলায় সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গীত "মিলে সব ভারত সন্তান" ও গণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গীত "লজ্জায় ভারত যশ গাহিব কি করে", গোবিন্দচন্দ্র রায়ের "কতকাল পরে বল ভারত রে" মনোমোহন বসুর "দিনের দিন সবে দীন ভারত হয়ে পরাধীন" দ্বারকানাথের "না জাগিলে সব ভারত ললনা" প্রভৃতি সঙ্গীতের সর্ব্বভারতীয় আবেদন হইতেই ইহা প্রমাণিত হইতেছে। ১৮৭৫ সালের মধ্যেই বাঙ্গালাদেশে এতগুলি জাতীয় সঙ্গীত রচিত হইয়াছে যে দ্বারকানাথ সেগুলিকে সংগ্রহ করিয়া উক্ত খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত করেন। ইহাই জাতীয় সঙ্গীতের প্রথম সংগ্রহ পুস্তক। জাতীয় সঙ্গীত ছাড়া জাতীয় ভাবাপন্ন বহু কবিতা ও গাথাও এই সময়ে রচিত হইয়াছিল। হেমচন্দ্রের "ভারত সঙ্গীত" ও নবীনচন্দ্র সেনের রচনা জাতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে প্রখ্যাত। বলা বাহুল্য ইঁহারা সকলে বন্ধনমুক্ত সমগ্র ভারতেরই স্বপ্ন দেখিয়াছেন।

কংগ্রেসের পূর্ব্বে যেরূপ কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পরেও সেইরূপ জাতীয় সঙ্গীত রচনায় বাঙ্গালীর প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। কংগ্রেসে জাতীয় সঙ্গীত গানের প্রবর্ত্তনও বাঙ্গলাতেই। ১৮৮৬ সালে কলিকাতা কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনে যুবক রবীন্দ্রনাথ স্বরচিত "মিলেছি আজ মায়ের ডাকে" সঙ্গীত গাহিয়া অধিবেশনের উদ্বোধন করেন। এই কংগ্রেস উপলক্ষে

রচিত হেমচন্দ্রের "রাখিবন্ধন'' কবিতা এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। "বন্দেমাতরম্" সঙ্গীত (১৮৮২) তৎকালে কংগ্রেসে গীত হয় নাই ইহাই ঐতিহাসিক দিগের অভিমত। হেমচন্দ্র কিন্তু উক্ত কবিতায় বলিতেছেন :—

"প্রণয়-বিহ্বলে ধ'রে গলে গলে,
গাহিল সকলে মধুর কাকলে
গাহিল—"বন্দেমাতরম্,
সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং
শস্যশ্যামলাম মাতরম্ ;
শুভ্রজ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীং
ফুল্লকুসুমিত-দ্রুমদল-শোভিনীং
সুহাসিনীং সুমধুরভাষিনীং
সুখদাং বরদাং মাতরম্
বহুবল ধারিনীং নমামি তারিনীং
রিপুদলবারিণীং মাতরম্।" [১]

লক্ষ্য করিবার বিষয় "বন্দেমাতরম্" সঙ্গীত লইয়া বহু বিতর্কের পর সঙ্গীতের এই অংশ পর্য্যন্তই জাতীয় অনুষ্ঠানে গেয় বলিয়া কংগ্রেস চূড়ান্তভাবে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন [২]। ১৯৩৭ সালের শেষাংশে

১ কবিতাটী হেমচন্দ্রের প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে নাই, তৎকালীন এক পুস্তিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। উদ্ধৃত অংশে শেষ পংক্তির পূর্ব্ববর্ত্তী তিন পংক্তি বাদ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু হেমবাবু এই ভাবেই উহা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

২ ১৯৩৭ সালের অক্টোবর মাসের শেষাংশে পণ্ডিত জওহরলালের সভাপতিত্বে কলিকাতায় নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনের সময় ওয়ার্কিং কমিটী এক বিবৃতিতে "বন্দেমাতরম্" সম্বন্ধে আপনাদের সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেন। উক্ত সিদ্ধান্তে বন্দেমাতরম্ খণ্ডনের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুস্থানী ভাষায় রচিত জাতীয় সঙ্গীতের জন্য আহ্বান করা হইয়াছিল কিন্তু অদ্য পর্য্যন্ত কোনো উপযুক্ত সঙ্গীত পাওয়া যায় নাই।

"বন্দেমাতরম"-খণ্ডন-ঘটিত বিতর্কে ৩০শে অক্টোবর রবীন্দ্রনাথের যে বিবৃতি প্রকাশ হয় তাহাতে তিনি বলেন যে ১৮৯৬ সালের কংগ্রেসেই "বন্দেমাতরম" সঙ্গীত প্রথম গীত হয়, তিনিই উহা গান করেন এবং উহার প্রথম দুই কলিই (অর্থাৎ হেমচন্দ্রের উদ্ধৃতাংশ পর্য্যন্তই) তিনি গাহিয়াছিলেন। কিন্তু প্রারম্ভ এই ভাবে হইলেও পরবর্ত্তীকালে ("বন্দেমাতরম্"-খণ্ডন সিদ্ধান্তের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত) কংগ্রেসে সমগ্র "বন্দেমাতরম্" সঙ্গীতই গীত হওয়া প্রথা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। যাহাই হউক, বঙ্কিমচন্দ্রের "বন্দেমাতরম্" বর্ত্তমান পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের জাতীয় সঙ্গীতের স্থান অধিকার করিয়া আছে এবং কংগ্রেসও উহাকে সেই ভাবেই লইয়াছে। সাম্প্রদায়িক দাবী পূরণের অস্বাভাবিক আগ্রহে ইহাকে খণ্ডিত করা হইয়াছে কিন্তু ত্যাগ করা সম্ভব হয় নাই। বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী যুগের সময় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত লোকের হৃদয়ে দেশপ্রেমের প্লাবন আনিয়াছিল এবং চিরকাল প্রেরণা আনিবে। এই সময়ে অন্যান্য অনেকেই জাতীয় সঙ্গীত রচনা ও প্রচার করিয়াছিলেন কিন্তু রবীন্দ্রনাথের দানই প্রচুর। "বন্দেমাতরম্" এর পরেই জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে স্থান পাইয়াছে রবীন্দ্রনাথের "জনগণমন-অধিনায়ক জয়হে" নামক সঙ্গীত, বিভিন্ন উপলক্ষে রচিত হইলেও "দেশ দেশ নন্দিত করি" সঙ্গীতের উল্লেখ করা যাইতে পারে। অন্যান্য প্রদেশে জাতীয় সঙ্গীত রচনা আরম্ভ হইযাছে অসহযোগ আন্দোলনের পর। কিন্তু তাহার কোনটীই সাহিত্যিক বা ভাবগত উৎকর্ষে বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথের রচনার কাছাকাছি উঠিতে পারে নাই অথবা সর্ব্বভারতীয় আবেদন ও সর্ব্বভারতীয় প্রেরণা জাগাইতে পারিল না। স্বতন্ত্র উদ্দেশ্যে রচিত স্যার মহম্মদ ইকবালের "হিন্দুস্থান হামারা" সঙ্গীতকে জাতীয় সঙ্গীতরূপে চালাইবার চেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু সমগ্রভাবে লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে জাতীয়তা ও দেশপ্রেম উহার মূলপ্রেরণা নহে।

# জাতীয় শিক্ষা ও জাতীয় প্রদর্শনী

অসহযোগ আন্দোলনে গবর্ণমেণ্ট-সংশ্লিষ্ট সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বর্জ্জন অন্যতম কর্ম্মপদ্ধতিরূপে প্রবর্তিত হওয়ার পর জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গঠনেব কথাটা সমস্ত ভারতবর্ষের চিন্তার বিষয় হইয়া উঠিয়াছিল। যদিও গান্ধীজী বলিয়াছিলেন যে ছাত্রদিগকে তিনি আহ্বান করিয়াছেন রাজনৈতিক আন্দোলনের কর্ম্মীরূপে কাজ করিবার জন্য, "খাঁচার পরিবর্ত্তে খাঁচায়" প্রবেশের জন্য নহে এবং ইহাও স্বীকৃত হইয়াছিল যে জাতীয় গবর্ণমেণ্ট ব্যতীত জাতীয় শিক্ষা প্রবর্ত্তন সম্ভব নহে তথাপি অংশতঃ ছাত্রদের প্রবোধদানের জন্য, অংশতঃ রাজনৈতিক প্রয়োজনেও * ভারতবর্ষের নানাস্থানে জাতীয় শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে স্কুল, কলেজ ও ইউনিভার্সিটী গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং সেগুলির কিছু কিছু এখনও বর্ত্তমান। ইহা ১৯২১ সালের ও তৎপরবর্ত্তী ঘটনা। বাঙ্গলাদেশে কিন্তু জাতীয় শিক্ষার আন্দোলন এবং জাতীয় শিক্ষার প্রতিষ্ঠান গঠন আরও ২৬।২৭ বৎসর পূর্ব্বের ব্যাপার. বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনের সময়েই ইহার উদ্ভব। জাতীয় শিক্ষা পরিষদ এবং যাদবপুর ইঞ্জিনীয়ারী কলেজ আজও সেই অতীত সাধনার সাক্ষী দিতেছে। ১৯০৬ সালে ১৫ই অক্টোবর ডাঃ রাসবিহারী ঘোষেব সভাপতিত্বে কলিকাতা টাউন হলে এক বিরাট জনসভায় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গঠিত হয়। ইহার জন্য রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিকের লক্ষ টাকা দান ইতিহাস-প্রসিদ্ধ হইয়া আছে। ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর এবং পরবর্ত্তী কালে স্যার রাসবিহারীর দানও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহা রাজনৈতিক প্রয়াস হইলেও তৎকালে বাঙ্গলার মনীষিসমাজ এ বিষয়ে অগ্রণী

* গ্রামে যাহারা রাজনৈতিক প্রচারকার্য্য করিতে যাইবে তাহাদের সম্বন্ধে মহাত্মাজীর নির্দেশ ছিল এই যে, প্রথমেই তাহারা শিক্ষাদানব্যপদেশে স্থানীয় বালকগুলিকে আপনাদের প্রভাবের আবর্ত্তে আনিবে।

হইয়াছিলেন। স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহাদের শীর্ষস্থানীয়। 'ডন' সোসাইটীর প্রতিষ্ঠাতা এবং 'ডন' পত্রিকার সম্পাদক সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় হইলেন ইহার অধ্যক্ষ। পরবর্ত্তীকালে বাঙ্গলাদেশে ও ভারতে চিন্তা ও মনীষার গৌরবে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন এমন অনেকেই এই জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সহিত ছাত্র বা শিক্ষকরূপে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। বাঙ্গলাদেশের নানাস্থানে ইহার শাখা ও ইহার অধীনে জাতীয় বিদ্যালয় গঠিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে চাঁদপুরের জাতীয় বিদ্যালয় বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। পরলোকগত হরদয়াল নাগের সুদীর্ঘজীবনের শেষ পর্য্যন্ত তিনি এই বিদ্যালয়টী চালাইয়া গিয়াছেন; এখনও ইহা বর্ত্তমান।

রাজনৈতিক প্রচারকার্য্যের অঙ্গ ও অবলম্বনস্বরূপে জাতীয় প্রদর্শনী সংগঠনের প্রয়াস কংগ্রেসের উদ্ভবের বহুপূর্ব্বেই বাঙ্গলাদেশে হইয়াছিল। ১৮৬৭।৬৮ সালের চৈত্রসংক্রান্তিতে গঠিত "চৈত্রমেলা" পরে "হিন্দুমেলা" এই প্রচেষ্টার প্রথম ফল। কেবল প্রদর্শনী হিসাবে নহে, যে ঘটনা-পরম্পরার ফলে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহার মধ্যেও হিন্দুমেলা উল্লিখিত হইয়া থাকে। হিন্দুমেলা গঠনের উদ্যোক্তা নবগোপাল মিত্র ও জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার এবং ইহার মূল প্রেরণাদায়ক ছিলেন রাজনারায়ণ বসু। একটা সর্ব্বভারতীয় জাতীয়তা ও সর্ব্বাঙ্গীন স্বাদেশিকতা জাগাইয়া তোলাই এই মেলার লক্ষ্য ছিল *। এই হিন্দুমেলার দ্বিতীয় অধিবেশনেই সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জাতীয় সঙ্গীত "মিলে সব ভারত সন্তান" প্রথম গীত হয়। রবীন্দ্রনাথ স্বীয় জীবনস্মৃতিতে লিখিয়াছেন—

"এই মেলায় দেশের স্তবগান গীত, দেশানুরাগের কবিতা পঠিত, দেশী শিল্প, ব্যায়াম প্রভৃতি প্রদর্শিত ও দেশী গুণীলোক পুরস্কৃত হইত।"

* মেলার দ্বিতীয়বারের মুদ্রিত কার্য্য বিবরণীতে উক্ত হইয়াছে—"আমাদের এই মিলন সাধারণ ধর্ম্মকর্ম্মের জন্য নহে, কোন বিষয়সুখের জন্য নহে, কোন আমোদপ্রমোদের জন্য নহে, ইহা স্বদেশের জন্য—ইহা ভারতভূমির জন্য"।

কংগ্রেসের অধিবেশনের সঙ্গে জাতীয় প্রদর্শনী গঠন বর্ত্তমান কংগ্রেসের মধ্যে অত্যন্ত প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। কংগ্রেস অধিবেশন যেমন দর্শনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ কংগ্রেসের সংশ্লিষ্ট প্রদর্শনী তদপেক্ষা কম দর্শনীয় বা গুরুত্বপূর্ণ নহে। পরলোকগত রাজেন্দ্রচন্দ্র দেবের নিকট শুনিযাছিলাম কংগ্রেসের সঙ্গে এই প্রদর্শনীর পত্তন বাঙ্গলাদেশে ১৮৯০ সালে কলিকাতা কংগ্রেসে। ফিরোজ্ শা মেটার সভাপতিত্বে মেটিয়াবুরুজের টিভলি গার্ডেনে এই অধিবেশন হয়। তবে ১৮৯০ সালের এই প্রদর্শনীটী তেমন বড হয় নাই। প্রচলিত ইতিহাস কিন্তু এই যে, কংগ্রেসের সহিত প্রদর্শনীর প্রবর্ত্তন ১৮৯৬ সালে কলিকাতায় তৃতীয় অধিবেশনে। এ অধিবেশন হয় বিডন স্কোয়ারে রহিমতুল্লা সিয়ানীব সভাপতিত্বে এবং ভারতবর্ষের নানা স্থান হইতে দর্শনীয় দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয়। প্রদর্শনীর দ্রব্য সংগ্রহের জন্য দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী সমগ্র উত্তর ভারত পরিভ্রমণ করেন। স্বদেশী আন্দোলনের সময় দেশীয় শিল্পের যে পুনর্জ্জীবন লাভ দেখা দেয় এই প্রদর্শনীতে তাহার সূচনা এবং শ্রীযুত জে, চৌধুবী মহাশয় ছিলেন ইহার উদ্যোক্তা। কংগ্রেসের সহিত দেশীয় শিল্প দ্রব্যাদির প্রদর্শনী করিবার ধারণা চৌধুরী মহাশয়ই প্রথমে প্রবর্ত্তন করেন। এই ব্যাপারে তাঁহাকেই অগ্রণী বলা যায় *। কংগ্রেসের সংশ্লিষ্ট বলিয়া তৎকালীন লেফটেনাণ্ট

* রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতিব বঙ্গানুবাদের ১১৮ পৃষ্ঠায় সম্পাদকীয় মন্তব্যে শ্রীযুত চৌধুরী মহাশয় লিখিয়াছেন—"আমি যে কংগ্রেসের সহিত স্বদেশী প্রদর্শনী যোগ করি সে কথা সত্য। তবে রাষ্ট্রগুরু যে লিখিয়াছেন যে ১৮৯৬ সালে কলিকাতা কংগ্রেসের অধিবেশনের সহিত স্বদেশী প্রদর্শনী সংযুক্ত করি সেটি ঠিক নহে। ১৯০১ সালে বীডন স্কোয়ারে যে কংগ্রেসের অধিবেশন হয় যাহাতে বোম্বায়ের খ্যাতনামা ব্যবহারাজীব (Solicitor) সেওয়ানি সভাপতি হন সেই কংগ্রেসের সহিত আমি একটী স্বদেশী প্রদর্শনী সংযুক্ত করি।" এখানে চৌধুরী মহাশয় বৎসর সম্বন্ধে ভুল করিয়াছেন। সেওয়ানি মহাশয়ের সভাপতিত্বে

গবর্ণর স্যার জন উডবর্ণ ইহার উদ্বোধনে যোগ দিতে সম্মত হন নাই। কংগ্রেস প্রদর্শনী অধিকতর বিরাট আকার ধারণ করে ১৯০৬ সালের কলিকাতা কংগ্রেসে। যেখানে এখন আলেকজান্দ্রা কোর্ট নামক প্রাসাদ অবস্থিত সেইখানে কংগ্রেস ও সম্মুখস্থ পোড়াবাজারের মাঠে প্রদর্শনী হইয়াছিল। বড়লাট লর্ডমিণ্টো এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন।

## বিলাতী আন্দোলন

কংগ্রেসের আর একটি বিষয়ের আলোচনা বাকী আছে। তাহা পূর্ব্বকালের বিলাতী আন্দোলন এবং এই আন্দোলনের সুবিধার জন্য পার্লামেন্টের পদ অধিকারের চেষ্টা। কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার বহু পূর্ব্বেই ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের পক্ষ হইতে লালমোহন ঘোষ একাধিকবার বিলাতে গিয়া এইরূপ আন্দোলন প্রবর্ত্তন করেন এবং তাঁহার অসাধারণ বাগ্মিতাশক্তি দ্বারা তৎকালীন বিখ্যাত বাগ্মী জন ব্রাইটেরও বিস্ময় উৎপাদন করেন। লালমোহনের পর কংগ্রেসের পক্ষ হইতে উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই আন্দোলন চালাইতে থাকেন। তিনি প্রায়ই বিলাতে থাকিতেন এবং শেষ জীবন বিলাতেই কাটাইয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহার পক্ষে এ আন্দোলন চালাইবার সুবিধাও ছিল। ইহার পর আন্দোলন চালাইতে থাকেন হিউম, ওয়েডারবার্ণ এবং দাদাভাই নওরোজী। এ বিষয়ে অম্বিকাচরণ মজুমদার মহাশয়ের রচিত "ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল এভোলিউসন" গ্রন্থে (১৩৮ পৃ) উক্ত হইয়াছে—"বিলাতে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান

বীডন স্কোয়ারে কংগ্রেসের অধিবেশন ১৮৯৬ সালেই হইয়াছিল। তবে ১৯০১ সালে দীনশা ওয়াচার সভাপতিত্বে কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনের সঙ্গেও একটা স্বদেশী প্রদর্শনী সংযুক্ত হয় (উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই প্রদর্শনীর সভাপতি হন)। এ অধিবেশনও হইয়াছিল বীডন স্কোয়ারে। সম্ভবতঃ তজ্জন্যই চৌধুরী মহাশয়ের ভুল হইয়া থাকিবে।

স্থাপনে প্রথমে উদ্যোগী হইয়াছিলেন দাদাভাই নওরোজী কিন্তু ১৮৮৮ সালে উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও মিঃ আর্ডলি নর্টন তাঁহার সহিত যোগ না দেওয়া পর্য্যন্ত তিনি বিশেষ কিছুই করিতে পারেন নাই।" পার্লামেণ্টের সভ্য হইবার চেষ্টা প্রথম করিয়াছিলেন লালমোহন ঘোষ। ডেপ্টফোর্ড হইতে তিনি প্রতিনিধিত্বের প্রার্থী হন; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত আইরিশ ভোটারগণ অপ্রত্যাশিতভাবে বিপক্ষগামী হওয়ায় পরাস্ত হন। ইহার পর উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও অনুরূপ চেষ্টা করিয়া সফল হইতে পারেন নাই—সফল হইয়াছিলেন দাদাভাই নওরোজী ১৮৯২ সালে। প্রথম দুইজন ভারতীয়ের চেষ্টা যে নওরোজী মহাশয়ের পথ সুগম করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। এই দুইজনই বাঙ্গালী।

---

# ইতিহাসের অবিচার

কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠায় ও পরিপুষ্টিসাধনে এবং সমগ্রভাবে রাজনৈতিক আন্দোলনের অগ্রগতিবিধানে বাঙ্গালীর যে সাধনা পূর্ব্ব দুই অধ্যায়ে তাহার আলোচনা করা হইয়াছে। বাঙ্গলার নিকট ভারতীয় রাজনীতির এই ঋণ পূর্ব্ব নেতৃবৃন্দ কি ভাবে স্বীকার করিয়াছেন স্বল্পপরিসরের মধ্যে তাহা যথাসম্ভব বিবৃত করিয়াছি। কিন্তু ইদানীং এই ঋণ স্বীকারে যে কুণ্ঠার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে তাহার কোন আলোচনা করা হয় নাই। বর্ত্তমান অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় ইহাই। এই আলোচনার জন্য সবিশেষ ঘটনাবলী উল্লেখের প্রয়োজন নাই। ইহার অত্যন্ত আধুনিক এবং অত্যন্ত স্পষ্ট দৃষ্টান্তস্বরূপে ডাঃ পট্টভী সীতারামিয়ার রচিত এবং কংগ্রেসের অনুমোদনক্রমে প্রকাশিত ও প্রচারিত "কংগ্রেসের ইতিহাস" আলোচনা

করিলেই বক্তব্য প্রতিপাদনের পক্ষে যথেষ্ট হইবে। আলোচনা ও বক্তব্য সম্যকভাবে উপলব্ধি করিবার জন্য এই ইতিহাসের রচনা ও প্রকাশ সংক্রান্ত প্রাথমিক ব্যাপারসমূহের কিঞ্চিৎ আলোচনা প্রয়োজন।

## ডাঃ পট্টভীর রচনার বিশেষত্ব

কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা ও প্রসারের বিবরণ সংগ্রহ বা ইতিহাস রচনার চেষ্টা ইতিপূর্ব্বেও পূর্ব্বতন কংগ্রেসনায়কগণের মধ্যে কেহ কেহ করিয়াছেন। ডাঃ এ্যানি বেসাণ্টের "How India Wrought Her Freedom" এবং অম্বিকাচরণ মজুমদারের "Indian National Evolution" ইহার দৃষ্টান্তস্থল। পূর্ব্বযুগের সুরেন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র প্রভৃতি এবং বর্ত্তমান কালে সুভাষচন্দ্র জওহরলাল প্রভৃতি আপনাদের আত্মজীবনীতে যাহা প্রকাশ করিয়াছেন ইতিহাসের উপাদান হিসাবে তাহার গুরুত্বও কম নহে। কিন্তু ডাঃ পট্টভীর রচনা হইতে ইঁহাদের রচনার পার্থক্য এই যে এ সমস্তই রচয়িতাদের ব্যক্তিগত প্রয়াস ও ব্যক্তিগত দায়িত্ব। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের কোনো উদ্যোগ, অনুমোদন বা সহযোগ এই সকল প্রয়াসের মধ্যে নাই। কংগ্রেসের উদ্যোগে কংগ্রেসের ইতিহাস প্রকাশের প্রথম দৃষ্টান্ত ডাঃ পট্টভী সীতারামিয়ার গ্রন্থ—"কংগ্রেসের ইতিহাস"। ১৯৩৫ সালে কংগ্রেসের জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষ্যে ইহা প্রকাশিত হয় এবং ইহা প্রকাশের সমগ্র ব্যয়ভার (৬০০০৲) কংগ্রেস বহন করেন। সুতরাং এই গ্রন্থকে লোকে কংগ্রেসের অনুমোদিত ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ করিতে চাহিবে ইহা নিতান্তই স্বাভাবিক। কিন্তু এক্ষেত্রে একটু বৈচিত্র্য আছে। পুস্তকের ভূমিকায় তৎকালীন রাষ্ট্রপতি বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ এই দায়িত্ব এড়াইতে চাহিয়াছেন। ডাঃ পট্টভীর রচনা সম্বন্ধে রাজেন্দ্রবাবু বলিতেছেন :—

> "He is not a detatched historian writing after the events and basing his conclusions on cold

recorded facts ....His conclusions and opinions are, therefore, his own and need not be treated as in every case representing the official view of the Working Committee of the Indian National Congress which publishes the book and sends it out to the world".

অর্থাৎ গ্রন্থে প্রকাশিত অভিমতসমূহ ডাঃ পট্টভীর নিজস্ব এবং তিনি নিজেই তজ্জন্য দায়ী। কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটী গ্রন্থের প্রকাশ ও প্রচার করিতেছেন বটে কিন্তু সকলক্ষেত্রে গ্রন্থোক্ত অভিমতসমূহের দায়িত্ব লইতেছেন না; উহা কংগ্রেসের অভিমত বলিয়া গ্রহণ করিবার প্রয়োজন নাই।

## কংগ্রেস ও কংগ্রেস সভাপতির দায়িত্ব

এই বিচিত্র ব্যবস্থার দ্বারা রাজেন্দ্রবাবু কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীকে ডাঃ পট্টভীর গ্রন্থের দায়িত্ব হইতে মুক্তি দিতে চাহিয়াছেন বটে কিন্তু কংগ্রেসের সভাপতি হিসাবে তিনি দায়িত্ব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত নহেন। পুস্তকের মুখবন্ধেই গ্রন্থকার ডাঃ পট্টভী বলিতেছেন—

" .... the book has been gone through by the President, twice over, and the thanks of the public, no less than of the author, are due to him for the hard work which the task of revision and correction entailed on him."

ডাঃ পট্টভীর উক্তি অনুসারে কংগ্রেস-সভাপতি বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ গ্রন্থখানি দুইবার আদ্যোপান্ত পড়িয়াছেন এবং পরিমার্জ্জনে ও সংশোধনে কঠোর শ্রম স্বীকার করিয়াছেন। ইহার পর এ কথা নিশ্চয়ই বলা চলে

যে এই পুস্তকে যাহা বলা হইয়াছে এবং যে ভাবে বলা হইয়াছে তাহাতে সমগ্রভাবে কংগ্রেসের হউক বা না হউক অন্ততঃ কংগ্রেস সভাপতির অনুমোদন রহিয়াছে। অধিকন্তু এই গ্রন্থের মুদ্রণ ও প্রকাশ অনুমোদন করিয়া ওয়ার্কিং কমিটী (১৯৩৫ সালের জুলাই ২৯—আগষ্ট ১) যে প্রস্তাব করেন তৎপ্রতি লক্ষ্য করিলে মনে হয় কংগ্রেসও ইহার দায়িত্ব হইতে মুক্তি পাইতে পারেন না। ওয়ার্কিং কমিটীর প্রস্তাবটী এইরূপ—

> "স্বলিখিত কংগ্রেসের ইতিহাসের পাণ্ডুলিপি কংগ্রেসকে দান করিবার জন্য ডাঃ পট্টভী যে প্রস্তাব করিয়াছেন তজ্জন্য ওয়ার্কিং কমিটী তাঁহাকে ধন্যবাদ জানাইতেছেন। কমিটী সভাপতিকে ইহা পড়িয়া দেখিতে অনুরোধ করিতেছেন এবং কংগ্রেসের পঞ্চাশৎ বর্ষপূর্ত্তির স্মারক গ্রন্থ হিসাবে ইহা প্রকাশ করা হইবে কি না তাহা চূড়ান্তভাবে স্থির করিবার ভারও তাঁহার উপরেই ন্যস্ত করিতেছেন।"

সাধারণভাবে এই পর্য্যন্ত আলোচনার পর বক্তব্যবিষয়ের আলোচনা করিব। ডাঃ পট্টভীর ইতিহাস সম্বন্ধে অভিযোগ এই যে ইহাতে বাঙ্গলার প্রতি অবিচার করা হইয়াছে। কংগ্রেস আন্দোলনে বাঙ্গলার দানের যতটুকু মূল্য নিরপেক্ষ বিচারেও দেওয়া উচিত ডাঃ পট্টভী তাহা দেন নাই। তাহা লঘু প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছেন। অধিকন্তু অনেক স্থলে বাঙ্গলাদেশ ও বাঙ্গালী জননায়কগণ সম্বন্ধে বিরুদ্ধ-সংস্কারের পরিচয় দিয়াছেন। ডাঃ পট্টভীর গ্রন্থ তাঁহার ব্যক্তিগত রচনা-মাত্র হইলে ইহা তত বেদনাদায়ক হইত না। কিন্তু কংগ্রেসের উদ্যোগে প্রকাশিত "কংগ্রেসের ইতিহাসে" এই অবিচার নিতান্ত কঠোর ও মর্ম্মপীড়া-কর পরিহাসের মত দেখাইতেছে। "কংগ্রেসের ইতিহাসের" বিরুদ্ধে এই যে অভিযোগ, ইহা উত্থাপনের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন স্বয়ং বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী। কমিটী এই অবিচারের প্রতিবাদে যে সুবিস্তৃত

মন্তব্য প্রকাশ করেন তাহাতে গ্রন্থের আপত্তিজনক অংশসমূহের কথা সবিশেষে উল্লিখিত হয় এবং উহার সংশোধন দাবী করা হয়।

## অবিচারের প্রতিবাদে ধীরেশচন্দ্র

বাঙ্গলার প্রতি এই অবিচারের প্রতিবাদে যিনি অগ্রণী হইয়াছিলেন এবং যাঁহার উদ্যোগে ও চেষ্টায় এই অবিচারের বিরুদ্ধে প্রাদেশিক কংগ্রেসের প্রতিবাদ সম্ভব হইয়াছিল তিনি আজ পরলোকে। পরলোকগত ধীরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর কথা বলিতেছি। ডাঃ পট্টভীর "ইতিহাসে" বাঙ্গলাদেশের সম্বন্ধে যে অবিচার করা হইয়াছে তৎপ্রতি তিনিই সর্ব্বপ্রথম সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এ বিষয়ে আলোচনা করিয়া তাঁহার সুবিস্তৃত ও সবিশেষ বিবৃতি ১৯৩৬ সালের ২৪শে মে তারিখে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। এই বিবৃতিতে উক্ত গ্রন্থের আপত্তিজনক স্থল-সমূহের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া তিনি তথ্য ও যুক্তিসহকারে উহাদের অসঙ্গতি এমনভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন যে সংবাদপত্রসমূহ একবাক্যে ইতিহাসের সংশোধন দাবী করে। ৪ঠা জুন তারিখে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের কার্য্যকরী সমিতির সভায় এই অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং আপত্তিজনক অংশ-সমূহের বর্জ্জন ও সংশোধন দাবী করিয়া এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। এ বিষয়ে কমিটীর অভিমত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর গোচর করিবার উদ্দেশ্যে সমগ্র গ্রন্থ পর্য্যালোচনা করিয়া মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিবার জন্য এক সাব-কমিটী গঠিত হয়—রাজেন্দ্রচন্দ্র দেব, বীরেন্দ্রনাথ মজুমদার এবং ধীরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী সাব-কমিটীর সভ্য নিযুক্ত হন। তিনজনই এখন পরলোকে।

এই ইতিহাসের পরিকল্পনা সমগ্রভাবে লক্ষ্য করিলে প্রথমেই অনুভূত হইবে যে গ্রন্থকারের মতে কংগ্রেসের ইতিহাস আরম্ভ হইল ১৯২০ সালে, অসহযোগ আন্দোলন ও গান্ধীজীর অভ্যুদয়ের সঙ্গে, তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী যে ঘটনাবলী তাহা একটা সংক্ষিপ্ত ভূমিকারূপে আলোচিত হইলেই যথেষ্ট।

বস্তুতঃ গ্রন্থকার তাহাই করিয়াছেন। ডাঃ পট্টভী নৈষ্ঠিক গান্ধীভক্ত এবং কংগ্রেসে গান্ধী-প্রভাব অব্যাহত বলিয়াই হয়ত গ্রন্থের পরিকল্পনা আপনা হইতেই এই আকার লইয়াছে। কিন্তু ইহাতে ইতিহাসের মর্য্যাদা রক্ষিত হয় নাই। ইতিহাসের দিক হইতে বিচারে ১৮৮৫ সাল হইতে ১৯২০ সাল পর্য্যন্ত ৩৫ বৎসরের ঘটনার গুরুত্ব ১৯২০ হইতে ১৯৩৫ পর্য্যন্ত ১৫ বৎসরের ঘটনার গুরুত্ব অপেক্ষা কোনো অংশেই কম নহে। এই অংশকে লঘু করায় বাঙ্গলা দেশের প্রতি বিশেষ অবিচার হইয়াছে এইজন্য যে, ১৮৮৫-১৯২০ পর্য্যন্ত যে পর্য্যায় সেই পর্য্যায়ে বাঙ্গালীর সাধনা, কৃতিত্ব ও প্রতিষ্ঠাই সমধিক। কংগ্রেসের ইতিহাসের এই অংশ প্রধানতঃ বাঙ্গালী-প্রভাবেই বিশিষ্টরূপ গ্রহণ করিয়াছে এবং ইহারই পরে কংগ্রেসের পরিচালন-ব্যবস্থা বাঙ্গলাদেশের আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। এই পুস্তকের পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনাতেও ইহাই পরিস্ফুট হইয়াছে আশা করি *।

## সুরেন্দ্রনাথের চরিত্রচিত্রণে ত্রুটি

কংগ্রেসের ইতিহাসের এই পর্য্যায়ে সর্ব্বাপেক্ষা বিরাট চরিত্র সুরেন্দ্রনাথ। তাঁহাকে যে "Father of Indian Nationalism" "Trumpet Voice of India" "রাষ্ট্রগুরু" প্রভৃতি আখ্যা দেওয়া হইয়াছে উহার মধ্যে বিন্দুমাত্র অত্যুক্তি নাই। ব্যক্তি-বিশেষের প্রভাবে কিরূপে রাজনৈতিক আন্দোলন সৃষ্ট, পরিচালিত ও রূপান্তরিত হয় ইদানীংকালে গান্ধীজীর জীবনে তাহা আমরা দেখিয়াছি। পূর্ব্বকালে সুরেন্দ্রনাথের কর্ম্মজীবনও তেমনি ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলনের সৃষ্টি ও পরিপুষ্টির ইতিহাস। গান্ধীজীর পূর্ব্বে তবু একটা ধারা গড়িয়া উঠিয়াছিল কিন্তু সুরেন্দ্রনাথকে সমস্তটাই সৃষ্টি করিয়া লইতে হইয়াছিল। এই সেদিনও সুরেন্দ্রনাথের

* এই পুস্তকের ১৬ পৃষ্ঠা ও ২৬ পৃষ্ঠার মন্তব্য দ্রষ্টব্য।

মূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষে স্যার তেজবাহাদুর সাপ্রু রাষ্ট্রগুরুর জীবন ও চরিত্রের এই মহিমা বাঙ্গালী সমাজকেই বিশেষ করিয়া স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন *। অতীতের দিকে চাহিয়া এখন মনে হয় আলোচ্য পর্য্যায়ের পরেই যে কংগ্রেসে বাঙ্গালী প্রভাব অবলুপ্ত হইয়াছে এবং কংগ্রেসের পরিচালন-ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে বাঙ্গালীর আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে সুরেন্দ্রনাথের কংগ্রেস হইতে অপসারণ তাহার একমাত্র অথবা প্রধানতম কারণ। তাঁহার ক্ষমতাহ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে উহা অগ্রসর হইয়াছে এবং ১৯১৭ সালে তাঁহার কংগ্রেসত্যাগে উহা সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার পর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মত শক্তিমান পুরুষও যে চেষ্টা করিয়া আর কংগ্রেস সংগঠন আপনার আয়ত্তে আনিতে পারেন নাই তাহা হইতেই সুরেন্দ্রনাথের কৃতিত্ব উপলব্ধি হইবে।

কংগ্রেসের ইতিহাসের এই পর্য্যায়ের যে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ডাঃ পট্টভী দিয়াছেন তাহার মধ্যেও সুরেন্দ্রনাথের চরিত্র-চিত্রণে তাঁহার অমার্জ্জনীয় ত্রুটি দেখিতে পাওয়া যায়। বঙ্গীয় কংগ্রেস কমিটীর সাব-কমিটীর রচিত বিবরণে ইহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে। সুরেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে ডাঃ পট্টভী পুনঃ পুনঃ এই কথাই বলিয়াছেন যে রাজভক্তি স্বীকারই (avowal of loyalty) তাঁহার চরিত্রের বিশেষত্ব ছিল এবং তাঁহার বক্তৃতাতেও ইহাই পরিস্ফুট হইত। "Loyalist" বলিতে আমরা যাহা বুঝি ডাঃ পট্টভীর অঙ্কিত চিত্র হইতে সুরেন্দ্রনাথকে তাহাই মনে হইবে। ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বঙ্গীয় কংগ্রেস কমিটীর রিপোর্টে যে সুবিস্তৃত আলোচনার দ্বারা ইহা সম্পূর্ণ খণ্ডন করা হইয়াছে তাহা বিবৃত করিবার স্থানাভাব। এখানে মাত্র এইটুকু উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে—

* ১৯৪১ সালের ৩১শে আগষ্ট কলিকাতা কার্জ্জন পার্কে মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে প্রদত্ত বক্তৃতা।

বৃটিশের সম্বন্ধে যে আস্থা বা বৃটিশ-সম্পর্ক বজায় রাখিবার যে স্বীকৃতি সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতায় পাওয়া যায় গান্ধীজীর উক্তি ও মনোভাবে এখনও তাহা পাওয়া যাইবে। বৃটিশ জাতির প্রতি এবং বড়লাটগণের প্রতি গান্ধীজীর পুনঃ পুনঃ বন্ধুত্ব-জ্ঞাপন যে অর্থে এবং যে ভাবে গ্রহনীয় সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতায় বৃটিশানুগত্যও সেই অর্থেই গ্রহণীয় হইবে।

সুরেন্দ্রনাথের পরবর্ত্তী যে পর্য্যায় লইয়া ডাঃ পট্টভীর ইতিহাস সেই পর্য্যায়ে বাঙ্গলাদেশের প্রধান চরিত্র চিত্তরঞ্জন, যতীন্দ্রমোহন, শাসমল ও সুভাষচন্দ্র। এই কয়জনেরই সম্বন্ধে তিনি কি অবিচার করিয়াছেন ধীরেশ বাবুর পূর্ব্বোল্লিখিত বিবৃতিতে তৎপ্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়, বঙ্গীয় কংগ্রেস কমিটীর রিপোর্টেও তাহা বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। শাসমলের মৃত্যুর উল্লেখ ব্যতীত তাঁহার সম্বন্ধে অন্য কোনো আলোচনা এই ইতিহাসে নাই। অথচ অসহযোগ আন্দোলনে যে সকল শক্তিধর জননায়কের উদ্ভব হইয়াছে শাসমল তাঁহাদের অন্যতম। বার্দ্দোলীতে গান্ধীজীর টেক্সবন্ধ আন্দোলন পরিকল্পিত হইয়াছিল কার্য্যে পরিণত হয় নাই। কিন্তু গান্ধীজীর পরিকল্পনারও পূর্ব্বে শাসমল মেদিনীপুর জেলার কাঁথি মহকুমায় টেক্সবন্ধ আন্দোলন প্রবর্ত্তন ও সফল করিয়াছিলেন (১৯২১)। অথচ ইহাতে তিনি কংগ্রেসের সহায়তা বা অনুমোদন লাভ করেন নাই, একক দায়িত্ব ও শক্তির উপরে নির্ভর করিয়াই তাঁহাকে ইহাতে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছিল।

## দেশবন্ধুর মর্য্যাদাহানি

বাঙ্গলার এই নেতৃবৃন্দের মধ্যে দেশবন্ধুর কথাই বিশেষ আলোচ্য। পূর্ব্বেই বলিয়াছি তাঁহার ন্যায় শক্তিশালী জননায়ক ভারতবর্ষে কেন, বিশ্বজগতের রাজনীতিতেও বড় বেশী আসেন নাই। দেশবন্ধুর রাজনৈতিক কার্য্যাবলীর আলোচনায় ডাঃ পট্টভী যে মনোভাব প্রদর্শন

করিয়াছেন তাহাতে স্পষ্টই মনে হয় গান্ধীজীর সহিত এবং গান্ধীজীর নৈষ্ঠিক অনুগামীদের সহিত দেশবন্ধুর সংঘর্ষের স্মৃতি তিনি এখনও ভুলিতে পারেন নাই। ১৯১৭ সালে সুরেন্দ্রনাথের কংগ্রেসত্যাগ এবং ১৯২০ সালের শেষাংশে গান্ধীজীর অভ্যুদয় ইহার মধ্যবর্ত্তিকালে কংগ্রেসে চিত্তরঞ্জন অন্যতম প্রধান নায়ক। তাঁহারই অভিমত অনুসারে কংগ্রেসের নীতি নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। গান্ধীজীর অভ্যুদয়ের পরেও চিত্তরঞ্জন স্বীয় ব্যক্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। অথচ ডাঃ পটভী সব সময়ই চিত্তরঞ্জনকে একটা হীনতর স্থান দিবার চেষ্টা করিয়াছেন এবং এই উদ্দেশ্যে কিম্বদন্তী ও জনরবের আশ্রয় লইতেও ইতস্ততঃ করেন নাই। ১৯২০ সালের ডিসেম্বরে নাগপুর কংগ্রেসের কথায় তিনি বলিতেছেন—"মিঃ সি, আর, দাশ পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম হইতে একদল ডেলিগেট লইয়া আসেন, তাহাদের যাওয়া-আসার খরচ বহন করেন এবং নিজের পকেট হইতে ৩৬০০০৲ টাকা ব্যয় করেন; কলিকাতার সিদ্ধান্ত (১৯২০, সেপ্টেম্বরে কলিকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে গৃহীত অসহযোগ প্রস্তাব) নাকচ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল।" পুনরায় বলিয়াছেন—"কলিকাতার সিদ্ধান্ত নাকচ করিবার জন্য নাগপুরে দাশ ৩৬০০০৲ টাকা খরচ করিয়াছিলেন ····· আমেদাবাদে উপস্থিত থাকিলে তিনি যে কি করিতেন বলিতে পারি না।" ইহার পরবর্ত্তী গয়া কংগ্রেস (১৯২২) সম্বন্ধে ইতিহাসকার বলিতেছেন—"গয়া কংগ্রেসে সভাপতিত্ব করিবার সময়ে দেশবন্ধুর পকেটে দুইটী মূল্যবান দলিল ছিল—একটী সভাপতির অভিভাষণ এবং অপরটী পদত্যাগপত্র ও স্বরাজ্যদলের গঠনতন্ত্র।

এই সকল উক্তির মধ্যে যে মনোভাব প্রকাশ পাইয়াছে তাহা কি ঐতিহাসিকের উপযুক্ত না এই সকল কল্পিত জনরব কংগ্রেসের ইতিহাসে স্থান পাইবার বস্তু? প্রদেশবিশেষ হইতে যথেষ্ট সংখ্যক ডেলিগেটের উপস্থিতিই যদি আপত্তি, বিরুদ্ধ সমালোচনা ও ইঙ্গিতের কারণ হয় তাহা হইলে

অন্যান্য বহুক্ষেত্রেও তাহা প্রযুক্ত হইতে পারে। ১৯৩৪ সালের অক্টোবর মাসে বাবু বাজেন্দ্রপ্রসাদের সভাপতিত্বে বোম্বাই সহরে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয় তাহাতে বিহার হইতে বহুসংখ্যক ডেলিগেট উপস্থিত ছিল। তখন বিহার প্রদেশ ভূমিকম্পে ( ১৫ই জানুযারী ১৯৩৪ ) সদ্য বিধ্বস্ত। সেই অবস্থায় কেমন করিয়া এতগুলি ডেলিগেট প্রেরণের অর্থসংস্থান করা সম্ভব হইল ডাঃ পটভীর প্রশ্নের অপেক্ষা ইহা অধিকতর স্বাভাবিক প্রশ্ন। বোম্বাই কংগ্রেসে সাম্প্রদাযিক সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে কংগ্রেসের নীতি নির্ণয় লইয়া পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়ের পরিচালিত কংগেস জাতীয় দলের সহিত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর সংঘর্ষ। সুতরাং বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের নেতৃত্বে এতগুলি ডেলিগেটের উপস্থিতি যে বিশেষ অর্থপূর্ণ তাহা উপলব্ধি করিতে বিলম্ব হয না। পুনরায ১৯৩৬ সালের এপ্রিল মাসে লক্ষ্ণৌ সহরে পণ্ডিত জওহরলালের সভাপতিত্বে কংগ্রেসের পরবর্ত্তী অধিবেশন। মন্ত্রিত্ব-গ্রহণ-বিরোধীদিগের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিয়া মন্ত্রিত্ব গ্রহণের পথ উন্মুক্ত রাখিবার জন্য ওয়ার্কিং কমিটীর প্রধান প্রস্তাবের প্রস্তাবক স্বয়ং পূর্ব্ব-সভাপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ। আশ্চয্য এই, বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের এই প্রস্তাবের আলোচনায পক্ষাপক্ষে ভোটের মোট যে সংখ্যা, কংগ্রেসে উপস্থিত ডেলিগেট-সংখ্যা অপেক্ষাও তাহা বেশী হইয়া পড়িযাছে। ডাঃ পটভী অনুমানের উপর দেশবন্ধু সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন। কিন্তু শেষোক্ত ঘটনায় যাহা উল্লেখ করিলাম তাহা প্রমাণিত ও স্বীকৃত। লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের অধিবেশনের সরকারী রিপোর্ট ( পৃ iv ও পৃ ৯০ ) লক্ষ্য করিলেই ইহা প্রতিপন্ন হইবে। গয়া কংগ্রেসে দেশবন্ধুর সভাপতিত্বকালের যে ঘটনা ডাঃ পটভী উল্লেখ করিযাছেন তাহা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। দেশবন্ধু তৎকালে পদত্যাগ করেন নাই। ১৯২৩ সালে মে মাসে বোম্বাই সহরে ভারত কংগ্রেস কমিটীর অধিবেশনকালে তিনি পদত্যাগ করেন। কংগ্রেস প্রস্তাবের সহিত মৌলিক মতভেদবশতঃ এই পদত্যাগ যে অত্যন্ত সঙ্গত

হইয়াছে তাহা স্বীকার করিয়া নবগঠিত ওয়ার্কিং কমিটী তাঁহাকে ধন্যবাদ দেন।

## দেশবন্ধু ও গান্ধীজী

দেশবন্ধুকে এইভাবে চিত্রিত করিয়া ডাঃ পট্টভী দেখাইতে চাহিয়াছেন যে গান্ধীজী সর্ব্বদাই তাঁহাকে মার্জ্জনা করিয়া সহিয়া ...য়াছেন—"Gandhi was ever generous, forgiving, appre... ive and affectionate towards Das"। ইহার প্রত্যুত্তরে বঙ্গীয় প্র... ...ক কংগ্রেস কমিটী যাহা বলিয়াছিলেন তাহাই উল্লেখ করিলাম—"... are not aware of any such guilt on Deshbandhu's pa... s needed a forgiving Gandhi for its expiation—দেশবন্ধুর এমন কোনো অপরাধ আমরা অবগত নহি যাহার মার্জ্জনার জন্য ক্ষমাপরায়ণ গান্ধীর প্রয়োজন হইয়াছিল।" বস্তুতঃ সমগ্রভাবে ডাঃ পট্টভী ইহাই দেখাইতে চাহিয়াছেন যে বেলগাঁও কংগ্রেসের ( ১৯২৪ ) পূর্ব্বে অর্থাৎ গান্ধীজীর কংগ্রেস হইতে সরিয়া যাইবার পূর্ব্বে দেশবন্ধু বিশেষ প্রাধান্য লাভ করেন নাই। স্বীয় সমর্থনে তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহাও সত্য ঘটনার বিরুদ্ধ। দেশবন্ধুর সম্বন্ধে অন্যান্য যে সকল মন্তব্যের বিরুদ্ধে বঙ্গীয় কংগ্রেস কমিটী আপত্তি জানাইয়াছিলেন তাহা উদ্ধৃত বা উল্লেখ করিবার স্থানাভাব।

## সেনগুপ্ত, শাসমল, সুভাষচন্দ্র

দেশবন্ধুর ন্যায় অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন না হইলেও, অন্যান্য প্রদেশে যাঁহারা প্রথম শ্রেণীর নেতা বলিয়া গণ্য হইয়াছেন যতীন্দ্রমোহন, শাসমল বা সুভাষচন্দ্র—যোগ্যতায় ও কৃতিত্বে তাঁহাদের কাহারও অপেক্ষা কম নহেন। বস্তুতঃ একই সময় একটা প্রদেশে এতগুলি যোগ্যতাসম্পন্ন রাজনৈতিক নেতার উদ্ভব কোথাও হয় নাই। "কংগ্রেসের ইতিহাসে"

শাসমলের স্থান কতটুকু তাহা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। যতীন্দ্রমোহন ও সুভাষচন্দ্রের কথা এইবার আলোচনা করিব। যতীন্দ্রমোহনের কৃতিত্ব সম্বন্ধে প্রসঙ্গক্রমে মাত্র উল্লেখ করা হইয়াছে—চট্টগ্রাম বন্দরে ধর্ম্মঘট ( আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে ধর্ম্মঘট ? ) এবং দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর "triple crown" "ত্রিমুকুট" ( মেয়র পদ, প্রাদেশিক কংগ্রেসের নেতৃত্ব এবং আইন সভায় কংগ্রেস দলের নেতৃত্ব) গ্রহণ। কংগ্রেসের একটিং প্রেসিডেণ্ট হিসাবে অমৃতসরে সেনগুপ্তের গ্রেপ্তার ( অক্টোবর ২৫, ১৯৩০ ) ওয়ার্কিং কমিটীর সদস্যরূপে ১৯৩২ সালে ১৮১৮ সালের ৩নং রেগুলেশনে গ্রেপ্তার ও মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত আটক,—ইহার উল্লেখ পর্য্যন্ত ডাঃ পট্টভীর গ্রন্থে নাই। সুভাষচন্দ্রের সম্বন্ধে তাঁহার সকল মন্তব্যই বিরুদ্ধ সংস্কারের দ্বারা প্রভাবিত। ১৯৩২ সালের আন্দোলনে গ্রেপ্তারের পর কারামুক্ত হইয়া ( মে, ১৯৩৩ ) কর্ম্মিগণেব ইচ্ছার বিরুদ্ধে গান্ধীজী আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিত করিলে ইয়ুরোপ-প্রবাস হইতে সুভাষচন্দ্র ( প্রেসিডেণ্ট প্যাটেলের সহিত ) যে বিবৃতি দিয়াছিলেন তৎসম্বন্ধে ডাঃ পট্টভীর মন্তব্য তাঁহার বিরুদ্ধ-সংস্কারের চরম প্রকাশ। তিনি বলিয়াছেন—"এই দুইজন বিবৃতিকারী কর্ত্তৃক গান্ধীজীব বিরুদ্ধ আলোচনা ইহাই প্রথম নহে, যদিও আন্দোলনের সময়ে স্বাস্থ্যহীনতার দরুণ তাঁহাদিগকে বিদেশে কাটাইতে হইয়াছে।" ১৯৩২ সালের ২রা জানুয়ারী ৩নং রেগুলেশনে গ্রেপ্তার হইবার পর সুভাষচন্দ্র যে মুক্তি পান নাই এবং তাঁহার ইয়ুরোপ-প্রবাস যে স্বেচ্ছাকৃত নহে পরন্তু নির্ব্বাসনমাত্র ইহা ডাঃ পট্টভীর অজ্ঞাত ছিল না। তথাপি এইরূপ অসঙ্গত ইঙ্গিত করিতে সঙ্কুচিত হন নাই।

## সঙ্কীর্ণতা ও পক্ষপাতিত্ব

নেতৃবৃন্দের জীবন ও কৃতিত্বের পরিচয় দানে কার্পণ্য করিলেও প্রদেশের আভ্যন্তরীণ রাজনীতির যে সকল ঘটনা বৃহত্তর ঐতিহাসিক আলোচনার

পক্ষে নিষ্প্রয়োজন তাহার আলোচনায় ডাঃ পট্টভীর আগ্রহের অভাব নাই। সেনগুপ্ত-সুভাষ-দ্বন্দ্ব, কর্মিসংঘের সহিত সেন গুপ্তের দ্বন্দ্ব প্রভৃতি বিষয়ও ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য স্থান পাইয়াছে এবং এই শ্রেণীর ঘটনার মধ্যে প্রবেশ করিতে গিয়া ডাঃ পট্টভী ভুলও করিয়াছেন। একটী দৃষ্টান্তই যথেষ্ট। তাঁহার মতে সেনগুপ্ত ও সুভাষচন্দ্রের দ্বন্দ্বের কারণ কাউন্সিল প্রবেশ লইয়া মতান্তর। অথচ সেনগুপ্ত ও সুভাষচন্দ্র দুই জনেই স্বরাজ্য-দলভুক্ত ছিলেন। কাউন্সিল-প্রবেশ সম্বন্ধে উভয়েই একমতাবলম্বী। ভারত কংগ্রেস কমিটীতে বাঙ্গালার প্রাদেশিক চাঁদা যথারীতি প্রদত্ত না হওয়ায় ১৯২৫ সালের জুন মাসে কমিটীর মাদ্রাজ অধিবেশনে বাঙ্গলার সদস্য-দিগকে প্রবেশাধিকার দেওয়া হয় নাই এটুকু পর্য্যন্ত ডাঃ পট্টভী উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু প্রদেশের পক্ষে শৃঙ্খলাভঙ্গ হিসাবে যে দৃষ্টান্ত উল্লিখিত হওয়া উচিত ছিল তাহার উল্লেখ করেন নাই। ১৯২৩ সালে গান্ধীজীর অনুগামীদের সহিত স্বরাজ্যদলের সংঘর্ষে কংগ্রেসে ক্রমশঃ স্বরাজ্যদলের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকিলে বল্লভভাই-পরিচালিত গুজরাট প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী ভারত কংগ্রেস কমিটীর নির্দ্দেশ পালনে অস্বীকৃত হয়। কিন্তু তাহাতে শৃঙ্খলারক্ষা বা দণ্ডদান তো সম্ভব হয়ই নাই; পরন্তু শৃঙ্খলা রক্ষার চেষ্টা করিতে গিয়া ওয়ার্কিং কমিটীকেই পরিত্যাগ করিতে হয়। গুজরাট কংগ্রেস কমিটীর এই আচরণে বিক্ষুব্ধ পণ্ডিত জওহরলাল স্বীয় আত্মজীবনীতে এ সম্বন্ধে যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহাতেই অবস্থা সুপ্রকাশ। পণ্ডিতজী বলিতেছেন—

> "We soon got into trouble on both sides. Guzrat, which was a no-change stronghold. refused to carry out some of the directions of the Central office. * * * The resignation (of the Working Committee) was brought about by the failure of

an attempt to censure Guzrat for its indisipline. I remember how gladly I sent in my resignation ; and how relieved I felt. Even a short experience of party manoeuvres had been too much for me, and I was quite shocked at the way some prominent Congressman could intrigue."

গান্ধীজীর কর্ম্মপদ্ধতিতে পরিবর্ত্তন-প্রয়াসী ও পরিবর্ত্তন-বিরোধীদের সংঘর্ষ আরম্ভ হইলে তৎকালে মধ্যবর্ত্তীদিগকে লইয়া ওয়ার্কিং কমিটী গঠিত হইয়াছিল। তাহারই উল্লেখ করিয়া পণ্ডিত জওহরলাল বলিতেছেন—

"শীঘ্রই আমরা দুইদিক হইতে বিপদে পড়িলাম। পরিবর্ত্তন-বিরোধীদের ঘাঁটী গুজরাট কেন্দ্রীয় অফিসের নির্দ্দেশ অনুযায়ী কাজ করিতে অস্বীকার করিল।......এই শৃঙ্খলা ভঙ্গের দরুণ গুজরাটকে দণ্ডদান প্রয়াসে ব্যর্থ হইয়াই ওয়ার্কিং কমিটীকে পদত্যাগ করিতে হয়। কিরূপ আনন্দের সহিত আমি পদত্যাগ পত্র প্রেরণ করিয়াছিলাম এবং পদত্যাগ করিয়া কিরূপ স্বস্তি অনুভব করিয়াছিলাম তাহা আমার এখনও স্মরণ আছে। দলের প্রাধান্য বজায় রাখিবার জন্য অবলম্বিত কৌশলের এই স্বল্পকালস্থায়ী অভিজ্ঞতাতেই আমি অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিলাম। বিশিষ্ট কংগ্রেস-নায়কেরা কিভাবে দল পাকাইতে পারেন তাহা দেখিয়া আমি মর্ম্মাহত হইয়াছিলাম।"

এতবড় ঘটনা উল্লেখ না করিলেও বাঙ্গলার নিতান্ত প্রাদেশিক ব্যাপারের প্রতি ডাঃ পট্টভী মনোযোগী ; অথচ বৃহত্তর রাজনীতিতে বাঙ্গলায় দানের মর্য্যাদা নির্দ্ধারণে পুনরায় কার্পণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। ১৯১৯ সালের এপ্রিলমাসে রাউলাট আইনের প্রতিবাদে এবং অসহযোগের প্রারম্ভে ছাত্র

আন্দোলনে বাঙ্গলার কৃতিত্ব সম্বন্ধে তিনি যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহাতেই ইহা সুস্পষ্ট।

## সংশোধনের নির্দ্দেশ

ডাঃ পট্টভীর ইতিহাসে বাঙ্গালার পক্ষে আপত্তিজনক যে দৃষ্টান্তসমূহ বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী উল্লেখ করিয়াছিলেন তাহাই যে সম্পূর্ণ নহে এ কথা তাঁহারা বলিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা যাহা বলিয়াছেন তাহাব সকলগুলিরও উল্লেখ বা আলোচনার স্থান নাই, বস্তুতঃ তাহাই একখনি পুস্তক হইবার যোগ্য। মোট ২৩টী ক্ষেত্রে গ্রন্থে উল্লিখিত বিষয় বর্জ্জন সংশোধন বা পরিবর্ত্তন করিতে তাঁহারা বলিযাছেন *। কংগ্রেসের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য অথচ ডাঃ পট্টভীর রচনায় অনুল্লিখিত ৪টী বিষয়ের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে—(১) পাঞ্জাব অত্যাচারের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথের উক্তি ও নাইট উপাধি ত্যাগ (২) আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে ধর্ম্মঘট ও চাঁদপুরে কুলী নির্য্যাতন (৩) শাসমল কর্ত্তৃক মেদিনীপুরে টেক্সবন্ধ আন্দোলন (৪) সুরেন্দ্রনাথেব জীবন ও কর্ম্মের যথাযথ বিবরণ। ইতিহাস বলিয়া উক্ত গ্রন্থকে যদি মর্য্যাদা দিতে হয় তাহা হইলে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর নির্দ্দেশসমূহ কার্য্যে পরিণত করিতেই হইবে। ইহা কিছু অস্বাভাবিক বা অপ্রত্যাশিতও নহে। এ সম্বন্ধে ধীরেশবাবুর পূর্ব্বোক্ত বিবৃতির প্রথমাংশ উদ্ধৃত করিতেছি—

"সম্প্রতি ডাঃ পট্টভী স্বরচিত কংগ্রেসের ইতিহাসে কানপুর

---

* ১৬৭ পৃ ২২ পং, ১৬৮, পৃ ১৪, পং, ১৬৯ পৃ ১ পং, ২৭৪ পৃ ১৩ পং, ২৭৫ পৃ ২১ ও ২৮ পং ৩৩৭ পৃ ২৬ পং, ৩৪৬ পৃ ১৫ পং, ৩৪৭ পৃ ৩০ পং, ৩৫৫ পৃ ১৭ পং, ৩৭০ পৃ ১০ ও ১১পং ৪১০ পৃ ২ ও ৩ পং, ৪২৫ পৃ ২৮ পং, ৪২৬ পৃ, ২ পং, ৪৬৬ পৃ ৩২ পং, ৪৭৪ পৃ ১৩ পং, ৪৭৯ পৃ ১৮ পং, ৪৮৬ পৃ ৩ পং, ৫১০ পৃ একটী সমগ্র প্যারা, ৫৪৭ পৃ ২৭ পং, ৬০৪ পৃ, ২৪ পং, ৬১০ পৃ ১৪ পং, ৯৪২ পৃ ফুটনোট, ১০১৮ পৃ একটী সমগ্র প্যারা।

> দাঙ্গা সম্বন্ধীয় মন্তব্যের কতগুলি সংশোধনের কথা প্রকাশ করিয়াছেন। ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে ( ১৯৩৬ এপ্রিল ) এই গ্রন্থ রচনার জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিবার প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে গ্রন্থে যে আরও আপত্তিজনক মন্তব্য আছে তৎপ্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। বাঙ্গলা ও দেশবন্ধু সম্বন্ধে গ্রন্থকারের মন্তব্যের কথা বিশেষভাবে উল্লিখিত হইয়াছিল। সুতরাং প্রয়োজনবোধে ডাঃ পট্টভী অন্যান্য-স্থলগুলিও সংশোধন করিবেন এই আশাতেই বিবৃতি প্রকাশ করিতেছি"।

বস্তুতঃ বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী "কংগ্রেসের ইতিহাসের" আপত্তিজনক স্থলসমূহ আলোচনা করিতেছেন এই সংবাদ প্রকাশিত হইলে ১৯৩৬ সালের ১৬ই জুন ইউনাইটেড প্রেসের মারফতে ডাঃ পট্টভী নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রকাশ করেন—

> "আমি আগ্রহের সহিত বি. পি. সি. সি. কাউন্সিলের অভিমতের প্রতীক্ষা করিতেছি ; তাঁহারা যদি বিবেচনা করেন যে গ্রন্থে এমন স্থল আছে যাহার বিরুদ্ধে সঙ্গতভাবে আপত্তি করা যায় তাহা হইলে আমি তাঁহাদের ইচ্ছানুযায়ী ব্যবস্থা করিতে আগ্রহী হইব, অবশ্য যদি কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট অনুমতি দেন।"

## ভবিষ্যৎ সতর্কতার প্রয়োজন

ইহার পর বি, পি, সি, সি, কাউন্সিলের অভিমত প্রকাশিত হইয়াছে কিন্তু তৎসম্বন্ধে ডাঃ পট্টভীর বা কংগ্রেস প্রেসিডেণ্টের ( তৎকালীন ও পরবর্ত্তী ) বা কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর কোনো অভিমত এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। এতদিনে ইহা তাঁহাদের চিন্তা হইতেও লোপ পাইয়া

থাকিবে। অথচ এইগুলি যদি সংশোধিত না হয় তাহা হইলে ইতিহাসের এই অবিচারই ইতিহাস বলিয়া চলিতে থাকিবে। সুতরাং পরবর্ত্তী সংস্করণে প্রয়োজনীয় সংশোধনের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর কোনো স্থায়ী বিবরণ নাই। তাঁহাদের আপত্তির বিবরণ ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির দপ্তরে রক্ষিত আছে এমন ভরসাও করি না। আর কিছুকাল পরে এইগুলি সংশোধনের হেতু ও প্রয়োজনীয়তার কথাও হয় তো লোকে ভুলিয়া যাইবে। ভবিষ্যতে কোনোদিন যাহাতে ইতিহাসের এই অবিচার সংশোধিত হয় সেই ভরসাতেই এখানে এই বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিলাম।